চৌধুরী শহীদ কাদের

বাংলাদেশ গণহত্যায় ধর্ম, লিঙ্গ ও বয়সের প্রভাব একটি কেস স্টাডি

Truth will come to light; murder cannot be hid long
Shakespeare, *Merchant of Venice*

ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য গণহত্যা-নির্যাতন।[১] বাংলাদেশ গণহত্যায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় সহযোগীদের দ্বারা ৩০ লক্ষেরও বেশি লোক প্রাণ হারায়। গণহত্যার সাধারণ বৈশিষ্ট্য, এটি নির্বিচারে সংঘটিত হয়। সাধারণ বৈশিষ্ট্য মেনে একাত্তরে সংঘটিত বাংলাদেশ গণহত্যাও নির্বিচারে, পরিকল্পনা মাফিক সংঘটিত হয়েছে। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করে দেওয়া হয়েছে, আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, লুট করা হয়েছে। মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে এত ছোট ভৌগোলিক সীমারেখায় ৩০ লক্ষেরও বেশি লোককে হত্যা ইতিহাসে আর দেখা যায় না। এই গণহত্যার তীব্রতা ছাড়িয়ে গিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সংঘটিত হলোকাস্টকে। এই ভয়াবহ গণহত্যার অন্তর্নিহিত কারণ কী ছিল? শুধু কি হিন্দুদের হত্যা করা হয়েছে, কিংবা গণহত্যার সময় কি নারী ও শিশুদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্ন বাংলাদেশ গণহত্যা নিয়ে। এই প্রবন্ধে গবেষণা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সেসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যেমন মূল লক্ষ্য ছিল ইহুদি নিধন, বসনিয়াতে যেমন সার্বরা মুসলমানদের বেছে বেছে হত্যা করেছে, একাত্তরে ঠিক তেমনি হিন্দুরা ছিল বিশেষ লক্ষ্য। ধর্ষণ কিংবা নানাভাবে নির্যাতিত ও নিগৃহীত হওয়ার নানা ন্যারেটিভে সয়লাব একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা। খুব সামান্যই উঠে এসেছে রণাঙ্গণে কিংবা সাহায্যকারী হিসেবে নারীর ভূমিকা। পাশাপাশি একাত্তরের নির্বিচার হত্যাযজ্ঞে বলি হয়েছেন শতশত নারী যে ইতিহাস প্রায়

বিস্মৃত। গণহত্যায় শুধু তরতাজা যুবকদের হত্যা করা হয়নি। হত্যা করা হয়েছে স্কুল ছাত্র, নাবালক থেকে শুরু করে শতবর্ষী বৃদ্ধকেও।

পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালির স্বাধিকারের স্বপ্নকে নসাৎ করতে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে গণহত্যাকে বেঁচে নেয়। এতো ছোট একটা ভূ-খণ্ডে মাত্র নয় মাসে ত্রিশ লক্ষ লোককে হত্যা করতে ঠিক কতটা বর্বরতার আশ্রয় নিতে হয়েছিল তাদের, কেস স্টাডিতে স্পষ্ট হয়েছে সেসব বিষয়।

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ পূর্ব পাকিস্তানের গণ আন্দোলনকে দমানোর কৌশল বাতলে দিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, “kill three million of them, and the rest will eat out of our hands.”[২] ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে ২৫ মার্চের রাতে অপারেশন সার্চলাইট শুরুর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী পূর্ব বাংলায় নরক নামিয়ে এনছিল। মাত্র নয় মাসে তিন লক্ষেরও বেশি লোককে তারা হত্যা করে, এক কোটি লোক গণহত্যা থেকে বাঁচতে আশ্রয় নেয় সীমান্তবর্তী ভারতে, প্রায় ৩ কোটি লোক শহরগুলো থেকে পালিয়ে গ্রামেগঞ্জে আশ্রয় নেয়।

১০০টি গণহত্যার কেস স্টাডি

একাত্তরের গণহত্যা ছিল সুনির্দিষ্ট লক্ষ সামনে রেখে হত্যা, ইংরেজিতে যা বলা যেতে পারে টার্গেট কিলিং। এই টার্গেট কিলিং কতটা পরিকল্পনা করে হয়েছিল সেটাই বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই কেস স্টাডিতে। আন্থনি ম্যাসকারেনহাস ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে কুমিল্লায় অবস্থিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৪ নং ডিভিশনের প্রধান কার্যালয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে এক সেনা কর্মকর্তা তাকে বলছিলেন, “হিন্দু সম্প্রদায়ের আমরা কেবল হিন্দু পুরুষদের হত্যা করেছি, হিন্দু নারী ও শিশুদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি। আমরা সৈনিক, নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করার মতো কাপুরুষ আমরা নই।”[৩]

কেস স্টাডিতে এখন দেখার বিষয় নারী এবং শিশুরা আসলেই কি রেহাই পেয়েছিল এই বর্বরতা থেকে? পূর্ববঙ্গের সিংহভাগ মুসলমানদের জীবনে ধর্ম কতটা রক্ষাকবচের ভূমিকা পালন করেছিল এই গণহত্যায়?

গণহত্যায় নিহতদের মধ্যে ধর্ম, লিঙ্গ ও বয়সের বিশ্লেষণে একাত্তরে বাংলাদেশে সংঘটিত ১০০টি পৃথক গণহত্যাকে বাছাই করা হয়েছে। গণহত্যা জাদুঘরের[৪] উদ্যোগে অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের সম্পাদনায় একাত্তরে সংগঠিত প্রত্যেকটি গণহত্যা নিয়ে পৃথক গ্রন্থ প্রকাশের একটি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যে সিরিজের নাম *গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা*। গণহত্যা জাদুঘরের বহুবিধ কার্যক্রমের একটি *গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট*

গ্রন্থমালা বা *জেনোসাইড ইনডেক্স*। দেশের আনাচে-কানাচে রয়েছে অসংখ্য বধ্যভূমি ও গণকবর। নির্যাতনের শিকার বহু নারী-পুরুষ এখনও রোমহর্ষক স্মৃতি রোমন্থন করেন। সেসব গণহত্যার বৃত্তান্ত, বধ্যভূমি ও গণকবরের কথা, এমনকি নির্যাতনের কথা বিজয়ের গৌরব-ভাষ্যে উপেক্ষিত থেকে গেছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায়, অনুপুঙ্খ ইতিহাস অনুসন্ধানে এসবের গুরুত্ব অপরিসীম। গণহত্যা, বধ্যভূমি ও নির্যাতনের ইতিহাস সংরক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত সংগ্রহশালা তৈরি আমাদের জাতীয় কর্তব্য। এর মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উঠে আসার পাশাপাশি উত্তরপ্রজন্মের মাঝে মুক্তিসংগ্রামের মর্মবাণী প্রতিভাত হবে। এই তাগিদ থেকে প্রায় বিস্মৃত সেসব গণহত্যা, বধ্যভূমি, গণকবরের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে জাদুঘরের উদ্যোগ *জেনোসাইড ইনডেক্স*। এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকালে গণহত্যা, বধ্যভূমি, গণকবর ও নানামুখী নির্যাতনের দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য উপকরণ সংগ্রহ এবং জাতির সামনে মুক্তিযুদ্ধের মর্মকথা তুলে ধরা। এরই আলোকে এ যাবতকালে প্রাপ্ত গণহত্যা ও বধ্যভূমির ওপর ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকটি গণহত্যার ইতিবৃত্ত তুলে ধরা **১৯৭১** *: গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালার* উদ্দেশ্য।

এর বিষয় বিন্যাসের মধ্যে রয়েছে স্থানটির ভৌগোলিক অবস্থান, তৎকালীন অবস্থা, গণহত্যার পটভূমি, গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ, শহিদ ও নির্যাতিতদের নাম-পরিচয়, ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীর মৌখিক ভাষ্য, গণহত্যায় জড়িতদের নাম-পরিচয়, বধ্যভূমি সংরক্ষণের প্রয়াস, বর্তমান অবস্থা এবং সার্বিক মূল্যায়ন। পুরো কাজটি গবেষণামূলক।

এ কাজের স্বাতন্ত্র্য এখানে যে, লেখক গণহত্যা ও বধ্যভূমির স্থলে সরেজমিন গিয়ে, খোঁজ-খবর নিয়ে গণহত্যা সংশ্লিষ্টজনের সঙ্গে কথা বলে, পর্যবেক্ষণ করে সেই অশ্রু-শোণিতের দিনগুলোকে অন্তরে অনুভব করে, তবেই প্রণয়ন করেছেন এই ভাষ্য। সবার হৃদয় নিংড়ানো কথামালা যেন এখানে মেলে ধরেছে ভয়াল দিনের স্মৃতি। ফলে এর মধ্য দিয়ে যে সেই গণহত্যা ও নির্যাতনের কথা অকৃত্রিমরূপে উঠে এসেছে।

এভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গণহত্যা—বধ্যভূমিগুলোকে নিয়ে এ পর্যন্ত ১০০টি পৃথক গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই কাজটি গণহত্যা-নির্যাতনের একাডেমিক ইতিহাস চর্চায় এনেছে নতুন দিগন্ত। এ ধরনের গ্রন্থমালা আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যা-নির্যাতন, বধ্যভূমি ও গণকবর সংক্রান্ত বিদ্যাচর্চায় এ গ্রন্থমালা বিশেষ আলো ফেলবে বলে মনে করা হয়।

গণহত্যাগুলো প্রশিক্ষিত গবেষকের মাঠ জরিপে প্রত্যক্ষদর্শী, ভুক্তভোগী ও স্বজনহারানোদের ভাষ্যের ওপর লিখিত। গণহত্যাগুলোর মধ্যে চুকনগর, পাহাড়তলীর মত প্রায় ১০,০০০ করে মানুষকে যেখানে হত্যা করেছে সংখ্যাও তীব্রতার দিক থেকে বৃহৎ গণহত্যা আছে। ঠিক তেমনি ভাতারমারী ইক্ষু ফার্ম গণহত্যার মত খুব ছোট (নিহতের সংখ্যার দিক থেকে) গণহত্যাও স্থান পেয়েছে, যেখানে মাত্র ৭জন শহিদ হয়েছেন।

১০০টি গণহত্যার ভৌগোলিক অবস্থান বিশ্লেষণে দেখা যায় দেশের ৪০টি জেলার ৯১টি উপজেলায় গণহত্যাগুলো সংঘটিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলায়। *[দেখুন: পরিশিষ্ট ১]*

১০০টি গণহত্যায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে বলে মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় উঠে এসেছে। যার মধ্যে শনাক্তকৃত (যাদের পরিচয় পাওয়া গেছে) শহিদদের সংখ্যা ৫০১৩ জন। কেনো গণহত্যায় শহিদের সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায় না। এটা থেকে অনুমান করা যায় গণহত্যায় নিহতদের দশভাগের প্রায় নয়ভাগ অজ্ঞাত। বিশেষ করে সীমান্ত এলাকাগুলোতে সংঘটিত গণহত্যা ও অভ্যন্তরীণ শরণার্থী হওয়ার কারণে এই গণ শহিদদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় না। সংঘটিত গণহত্যাগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান আরেকটি বিষয় স্পষ্ট করে সেটি হল পাকিস্তানি বাহিনী কতটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে গণহত্যা চালিয়েছে। বাগেরহাটের রামপাল উপজেলা সদর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে ডাকরা গণহত্যা সংঘটিত হয়। রাজশাহীর পবা উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম বাগধানী পালপাড়ায় সংঘটিত হত্যা কিংবা খুলনার চরেরহাট কিংবা পাবনার আটঘরিয়া। ভৌগোলিক অবস্থান, জেলা ও উপজেলাভিত্তিক গণহত্যার সংজ্ঞা, গণহত্যার তীব্রতা, শহিদের সংখ্যা ও শনাক্তকৃত শহিদদের পরিচয় এই ১০০টি গণহত্যা বাংলাদেশে একাত্তরে সংঘটিত গণহত্যার প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। ২০১৪ সাল থেকে এই নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালার কাজ শুরু হয় ১০০তম গণহত্যার গ্রন্থটি প্রকাশ পেয়েছে জুন ২০২০ সালে। প্রায় ৬ বছর ধরে চলমান এই গবেষণা কার্যক্রমের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে বাংলাদেশ গণহত্যায় নিহতদের ধর্মীয় পরিচয় লিঙ্গ কিংবা বয়সভিত্তিক বিভাজন জানা সম্ভব। যেগুলো আরো বিস্তারিত গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি করবে। এই নির্ঘণ্ট সিরিজের সম্পাদক ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন ভূমিকায় এই গ্রন্থমালা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "প্রত্যেকটি গ্রন্থ লেখকের স্বকীয়তা বজায় রেখেও নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে প্রণীত হচ্ছে। এর বিষয়-বিন্যাসের মধ্যে রয়েছে স্থানটির

ভৌগোলিক অবস্থান, তৎকালীন অবস্থা, গণহত্যার পটভূমি, গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ, শহিদ ও নির্যাতিতদের নাম পরিচয়, ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীর মৌখিক ভাষ্য, গণহত্যায় জড়িতদের নাম-পরিচয়, বধ্যভূমি সংরক্ষণের প্রয়াস, বর্তমান অবস্থা ও সার্বিক মূল্যায়ন। পুরো কাজটি গবেষণাধর্মী ও অনুসন্ধানমূলক।"[৫]

গবেষণা পদ্ধতি

এই প্রবন্ধে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত ১০০টি গণহত্যার তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কেস স্টাডিতে ব্যবহৃত ১০০টি গণহত্যা নিয়ে পৃথক পুস্তক প্রকাশ করেছে গণহত্যা জাদুঘর ও গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র। ১০০টি গণহত্যার মধ্যে ৬টি গণহত্যার গবেষণা আমি করেছি, প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত থাকার ফলে বাকী গ্রন্থগুলোর প্রকাশনায়ও নানাভাবে আমার সম্পৃক্ততা ছিল।[৬] এই ১০০টি গণহত্যার সিরিজের নাম দেওয়া হয়েছে জেনোসাইড ইনডেক্স। যেখানে প্রশিক্ষিত গবেষক মাঠে গিয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছে। মূলত কথ্য ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে গণহত্যার ইতিহাস পুর্নর্নির্মাণের একটি প্রচেষ্টা এটি।

কেস স্টাডিতে ব্যবহৃত গণহত্যার ঘটনাগুলো মাঠ পর্যায়ে গবেষণা করে গণহত্যার সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যক্ষদর্শী, ভুক্তভোগী ও স্বজনহারাদের মৌখিক সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত। প্রত্যেকটি গণহত্যার ঘটনা, গণহত্যা-নির্যাতনের বিবরণ, ঘাতকের পরিচয়, শহিদ শনাক্তকরণ ও গণহত্যাটির মূল্যায়ন গ্রন্থগুলোতে রয়েছে।

এই প্রবন্ধে প্রাথমিক উৎসের ভিত্তিতে রচিত ১০০টি গণহত্যার তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে গণহত্যা কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। *[দেখুন : পরিশিষ্ট ২]*

নারীরা কি রেহাই পেয়েছিল গণহত্যা থেকে?

১০০টি কেস স্টাডিতে শনাক্তকৃত ৫০১৩ জন শহিদদের মধ্যে নারীর সংখ্যা ১৭৮ জন যেটি শনাক্তকৃত মোট শহিদদের ৩.৫৫ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি নারী গণহত্যার শিকার হয়েছেন চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার মুজাফফরাবাদ গণহত্যায়। মাঠ পর্যায়ের গবেষণার প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের সাক্ষ্যে এই গণহত্যায় এতো নারী কেন নিহত হয়েছেন তার স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়। পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা পুরো পাড়াতে ত্রাস সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, ফলে নারী, শিশু যাকে পেয়েছে হত্যা করেছে। এই গণহত্যায়

২টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে, প্রথমটি হচ্ছে ধর্ষণের পর নারীকে হত্যা, দ্বিতীয়টি ধর্ষণের পর লোকলজ্জার ভয়ে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করা।

ফরিদপুরের নগরকান্দার কোদালিয়া শহিদনগর গণহত্যায় ২৪ জন নারীকে হত্যা করা হয়। ৩৭ জন শনাক্তকৃত শহিদের মধ্যে ২৪ জন নারী (প্রায় ৬৫ শতাংশ)। ২ বছরের পারভীন থেকে শুরু করে ৭৫ বছরের মাজ্জুম খাতুন কেউ রেহাই পায়নি পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা থেকে। এই গণহত্যার প্রকৃতি ছিল প্রতিশোধ পরায়ণতা। ২৮ মে ১৯৭১ সালে ১৭ জন পাকিস্তানি সেনা নগরকান্দায় প্রাণ হারান। এটার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী কোদালিয়া আক্রমণ করে। যাকে পেয়েছে হত্যা করেছে। শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভবর্তী নারী কেউ রেহাই পাননি।[৭] *[দেখুন : পরিশিষ্ট ৩]*

৪৬টি গণহত্যায় নিহত নারীর সংখ্যা শূন্য, ১৩টিতে একজন অথবা দুইজন শহিদ হয়েছেন। অ্যাডাম জোনস বাংলাদেশ গণহত্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন, এখানে পরিকল্পিতভাবে পুরুষদের টার্গেট করা হয়েছে। এই কেস স্টাডিতে সেই বিষয়টি স্পষ্ট। তবে সাধারণত গণহত্যায় নারীদের নির্বিচারে হত্যা করার নজির দেখা যায় না। একাত্তরে কমপক্ষে ১০,০০০ নারীকে গণহত্যায় প্রাণ দিতে হয়েছে। তবে এই সংখ্যা আরো অনেক বেশি। গণহত্যায় নির্বিচারে নিহতদের শনাক্ত করতে না পারায় স্পষ্ট সংখ্যা বলা সম্ভব হচ্ছে না। চুকনগর গণহত্যায় প্রায় ১০,০০০ লোককে হত্যা করা হয়েছে। যাদের মধ্যে মাত্র ৩৭ জনকে শনাক্তকরণ সম্ভব হয়েছে।[৮] প্রশ্ন উঠছে কীভাবে সম্ভব ১০,০০০ জনের মধ্যে মাত্র ৩৭ জন শনাক্তকরণ। অনেকে এটাকে অতিরঞ্জিত বলছেন। কিন্তু বিষয়টির পারিপার্শ্বিকতা দেখলে বোঝা যায় গণহত্যায় শহিদদের সবাই এখানে জড়ো হয়েছিলেন দেশের দক্ষিণাঞ্চলের নানা প্রান্ত থেকে পাশের সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারত প্রবেশের জন্য। যাদের একটি অংশ ছিল নারী ও শিশু। ফলে সীমান্ত এলাকায় পরিচালিত গণহত্যাগুলোর নিহতদের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি বলে বাংলাদেশ গণহত্যায় নিহত নারীদের সংখ্যাতাত্ত্বিক ধারণা পাওয়া অসম্ভব। তবে এটা স্পষ্ট গণহত্যায় নির্বিচারে নারীদেরও হত্যা করা হয়েছে। কোথাও পুরো গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে নারীদের। ধর্ষণের পর হত্যা করেছে, ধর্ষণে বাধা দেয়ায় হত্যা করা হয়েছে।

একাত্তরে গণহত্যায় নারীর জীবন কতটা বিপন্ন হয়েছিল তা উঠে এসেছে ঝাউডাঙ্গা গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী মো. মতিউর রহমানের বর্ণনায়, "ঐদিন দেখছিলাম একজন মৃত মায়ের বুকের উপর একটি শিশু তখনো তার

মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার চেষ্টা করছে।"[৯] তবে অনেকগুলো গণহত্যায় নারীদের ছেড়ে দেওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। দিনাজপুরের বোচাগঞ্জের দৌমোহনী ঘাট গণহত্যায় দেখা যায় শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, শুধু পুরুষদের লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা হয়েছে।[১০]

সিলেটের তারাপুর চা বাগান গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী বিশাখা সমাদ্দার বলছিলেন, গণহত্যায় বাগানের সব পুরুষকে মেরে ফেলা হয়েছে।[১১] শেরপুরের নলিতাবাড়ির সোহাগপুর গ্রামে ৬ ঘণ্টায় ১৮৭ জন পুরুষকে হত্যা করে গ্রামটিকে পুরুষ শূন্য করে ফেলা হয়। গ্রামটি বিধবাদের গ্রাম নামে পরিচিতি পায়।[১২]

বয়স কতটা বিবেচ্য ছিল

একাত্তরে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত গণহত্যায় বয়স কোন বিবেচ্য বিষয় ছিল না। শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলকেই তারা নির্বিচারে হত্যা করেছে। তবে ১০০টি গণহত্যার কেস স্টাডি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গণহত্যায় তাদের মূল লক্ষ্য ছিল তরুণ, যুবকদের হত্যা করা। নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার পাকুড়িয়া গণহত্যায় দেখা যায় পাকিস্তানি সেনারা যুবকদের আলাদা করে হত্যা করছে। অল্প বয়সের ছেলেদের এবং বৃদ্ধ বয়সের লোকজনকে তারা ছেড়ে দিচ্ছে।[১৩] এই গণহত্যায় শনাক্তকৃত ৭৩ জন শহিদের প্রত্যেকের বয়স ছিল ২০-৪৫ বছরের মধ্যে।

সাতক্ষীরার ঝাউডাঙ্গা গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী গীতা মন্ডল বলছিলেন, 'যুবক ও জোয়ান পুরুষদের তারা বেশি হত্যা করছিল'।[১৪] নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের তারা ছেড়ে দিয়েছিল। নাটোরের বিলমাড়িয়া গণহত্যায় শনাক্তকৃত ৪০ জন শহিদদের প্রত্যেকের বয়স ২০-৪০ বছর, এখানে যুবকদের ধরে ধরে হত্যা করা হয়েছে।[১৫]

ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলার হরিপুর গণহত্যায় দেখা যায়, প্রবীনদের ছেড়ে দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী তরুণদের ব্রাশফায়ার করে হত্যা করেছে।[১৬] বরগুনা জেলা কারাগার গণহত্যায় ২০-৪৫ বছরের সকল পুরুষদের হত্যা করা হয়।[১৭] রাজশাহীর মোহনপুরের মুগরুল গণহত্যায় ১৬ বছরের স্কুল ছাত্র ইদ্রিস হোসেন, রিয়াজউদ্দীন, হাবিবুর রহমান শেখকে হত্যা করে পাকিস্তান বাহিনী, এখানে মূলত বয়সে যারা তরুণ তারাই হয়েছেন গণহত্যার মূল লক্ষ্য।[১৮]

১০০টি গণহত্যার কেস স্টাডি করে যে বয়সভিত্তিক বিভাজন করা

হয়েছে তাতে দেখা যায়, শনাক্তকৃত শহিদদের মধ্যে ১৬-৪০ বছর বয়সের নিহতের সংখ্যা ৫৯%, ৪১-৬০ বছর বয়সের লোক ৩০% অর্থাৎ একাত্তরে বাংলাদেশে সংঘটিত বর্বরতম গণহত্যায় প্রায় ৮৯% লোকের বয়স ১৬-৬০ বছর।

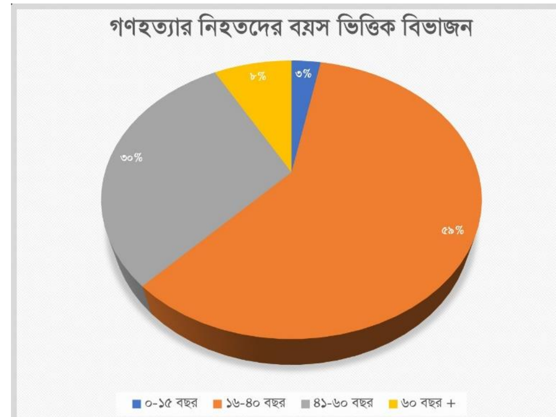

ছবি ১: শনাক্তকৃত শহিদদের বয়সভিত্তিক বিভাজন

১০০টি গণহত্যার ঘটনা পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যেসব গণহত্যার লক্ষ্য ছিল প্রতিশোধ। সেসব গণহত্যায় অপেক্ষাকৃত তরুণ যুবাদের বেশি হত্যা করেছে। কাউকে ছাড় দেওয়া হয়নি। বিশেষ করে পাকিস্তানি বাহিনী বা তাদের সহযোগীদের ওপর আক্রমণের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যেসব গণহত্যা সেগুলোতে সম্ভাব্য আক্রমণকারী বিবেচনা করে যুবকদের বেশি হত্যা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিটঘর গণহত্যায় শহিদ ৮০ জনের বয়স ও গণহত্যার পটভূমি বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়।[১৯]

ছাব্বিশা গণহত্যায় দেখা যায় বিশেষ করে তরুণ ও যুবকদের লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হয়েছে। কারণ ছাব্বিশা যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর হাতে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য হতাহত হন। সেটার প্রতিশোধ নিতে মুক্তি সন্দেহে এলাকার যে সকল যুবকদের ধরতে পেরেছিল সকলকেই হত্যা করে।[২০]

একাত্তরের পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মমতায় ১৬-৫০ বছরের লোকজন বেশি গণহত্যার শিকার হয়েছেন। 'মুক্তি' কিংবা আওয়ামী লীগ সন্দেহে কিংবা মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিতে পারে এসব কারণে গণহত্যাগুলোতে

তাদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। তবে ময়মনসিংহের শালিহর গণহত্যায় ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ করলে পাড়ার সকলে পালিয়ে যায়। কিন্তু যেতে পারেননি কয়েকজন প্রবীন লোক। কৈলাস দাস, মোহিনী কর, জ্ঞানেন্দ্র কর, কামিনীকান্ত দাস, তারিনী কান্ত দাস শীরদা সুন্দরী, রায়চরণ দাস, শচীন্দ্র দাস, যোগেশ চন্দ্রপন্ডিত কিংবা ছাবেদ আলী যাদের সকলের বয়স সত্তর উর্ধ্ব। পাকস্তানি বাহিনীর হঠাৎ আক্রমণে পালাতে না পেরে গণহত্যার শিকার হন। বয়স বিবেচনায় প্রবীন এই লোকগুলো রেহাই পাননি পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতা থেকে।[২১]

খুলনা জেলার ডুমুরিয়ার রংপুর গণহত্যায় নিহত বারো জনের অন্তত ছয় জনের বয়স ছিল ষাটের অধিক। এই বয়সে তাঁদের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া সম্ভব ছিল না। বয়স্ক এই ব্যক্তিরা যে এলোপাথাড়ি গুলিতে মারা পড়েছিলেন এমন নয়। পাকিস্তানি সেনারা এঁদের সকলকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করেছিল।[২২] খুলনার তেরোখাদার আজগড়া গণহত্যায় ৭০ বছরের হীরালাল ভেবেছিল, এই বয়সে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাকে মারবেন না। ৭৩ বছরের বৃদ্ধ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষালের বিশ্বাস ছিল তিনি ভালো উর্দু জানেন, তাদের বুঝিয়ে বলবেন, এখানে কোন আওয়ামী লীগ নেই, মুক্তি নেই। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনীর বুলেট, বর্বরতা তাদের সেই সরল বিশ্বাসকে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দেয়।[২৩] কিংবা সন্ন্যাসী সিকদার যার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর, রেহাই পাননি এই পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে।

একদিকে দেখা যাচ্ছে প্রায় **১৫**টি গণহত্যা যেগুলো সংঘটিত হয়েছে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সেগুলোতে তরুণ-যুবকদের হত্যা করা হয়েছে বেশি। তবে দিনাজপুর সদর উপজেলার ঝানজিরা গণহত্যায় ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। দক্ষিণঘাট যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে যুব থেকে শুরু করে বয়সী মানুষ সবাইকে তারা হত্যা করেছে।[২৪]

রাজশাহীর পবার বাগধানী গণহত্যায় ৮০ বছরের বৃদ্ধ কার্তিক চন্দ্রপাল, ৭৫ বছরের ধীরেন পাল, ৭০ বছরের ভোলানাথ পাল কিংবা ষাটোর্ধ্ব শংকর পাল, প্রফুন্ন চন্দ্র পাল ও অবনী কুমার পালকে পাক বাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করে। এই গণহত্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সাধারণত এই ধরনের বয়স্ক লোকজনকে পাকিস্তানি বাহিনী ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু এখানে সবাইকে হত্যা করেছে কারণ আক্রোশটা ছিল পাড়ার লোকজনের ওপর।[২৫]

বয়স যে কতটা অবিবেচ্য বিষয় ছিল তা দেখা যায় চট্টগ্রাম শহরের নাথপাড়া গণহত্যায়। বনমালী নাথের ৮ বছরের কন্যা শিশু মিনুকে মার কোল থেকে আছাড় মেরে হত্যা করেছে বিহারি সহযোগীরা।[২৬] ফরিদপুরের

কোদালিয়া গণহত্যায় ২ বছরের শিশুকে গুলি করে হত্যা করে পাকিস্তানি বাহিনী।[২৭] রাজশাহীর রানীনগর গণহত্যায় ৫ মাস বয়সের শিশু মুসাকে ও ২ বছরে তুহিনকে হত্যা করা হয়।[২৮] এই গণহত্যায় পুরুষের তুলনায় নারী ও শিশুদের বেশি হত্যা করা হয়েছে। কারণ পুরুষরা পালিয়ে ভারত চলে গিয়েছিল। তারা ধারণা করেছিল পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নারী ও শিশুরা নিরাপদ থাকবে। বিড়ালদহ গণহত্যায় দেখা যায় পাকিস্তানি বাহিনী নির্মমভাবে শিশুদের হত্যা করছে।[২৯]

আবার শিশু দেখে ছেড়ে দেওয়ার বিবরণও পাওয়া যায়। তারাপুর চা বাগানের পঙ্কজ কুমার গুপ্ত বলছিলেন, তাকে হত্যা করতে চাইলে এক সুবেদার বলেন, 'বাচ্চা লোক হ্যায়'। বেঁচে যান পঙ্কজ।[৩০] কেস স্টাডিতে দেখা যায়, ০-১৫ বছর বয়সের শিশু কিশোরদের হত্যার হার ছিল ০৩ শতাংশ। আর ষাটোর্ধ্ব লোক হত্যার হার ছিল ০৮ শতাংশ তাই এই কেস স্টাডি থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় একাত্তরে পাকিস্তানি বাহিনীর মূল লক্ষ্য ছিল সক্ষম লোকজন। যারা তাদের প্রতিরোধ করতে পারবে। তাই এসব গণহত্যার একটি উদ্দেশ্য ছিল হত্যার মাধ্যমে প্রতিরোধের দেয়াল ভেঙ্গে দেয়া। শিশু কিংবা বয়স্কদের যে হত্যা সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করেছে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে। পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে। অনেক ক্ষেত্রে বাবাকে না পেয়ে শিশু সন্তানকে হত্যা, বয়স্ক লোককে হত্যার বিবরণ গণহত্যার কেস স্টাডিতে দেখা যায়।

ধর্মীয় পরিচয় কি হিন্দুদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল?

একাত্তরে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়া ছিল মৃতুদণ্ডযোগ্য অপরাধ।[৩১] গণহত্যায় এই দেশের হিন্দু জনগোষ্ঠী বিশেষ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। গণহত্যার মুখে বিপুল সংখ্যক হিন্দু পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। দেশে যারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন কিংবা থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন তাদেরও হত্যা, ধর্ষণ ও নানা রকম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। পাকিস্তানিরা ছিল হিন্দু বিদ্বেষী, হিন্দুদের উপর তাই আক্রোশটাও ছিল বেশি। 'হিন্দু নারীরা তখন মাথার সিদুঁর মুছে ফেলত, পুরুষরা মাথায় টুপি পড়ত, ধুতির বদলে লুঙ্গি পড়ত। পাকিস্তানিরা 'চার কলেমা'র মাধ্যমে হিন্দু মুসলিম যাচাই করতো; কেউ বলতে না পারলেই গুলি করে হত্যা করা হত। কখনও কখনও লুঙ্গি খুলে পরীক্ষা করতো হিন্দু না মুসলমান! পাকিস্তানের কাছে হিন্দু জনগোষ্ঠী ছিল ভারতীয়। তাই হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর আক্রমণের ধরন এবং মাত্রার তীব্রতার পেছনে কাজ করেছিল পাকিস্তানকে নিরাপদ রাখার বাসনা।[৩২] এন্থনি

মাসকারেনহাসের কাছে একজন পাঞ্জাবী মেজর জানিয়েছিল, "আমরা একজন বুড়ো লোককে আটক করি। ঐ বেজন্মাটার দাড়ি ছিল এবং সে একজন খোদাভীরু মুসলমানের মতো আচরণ করতে শুরু করে। এমনকি তার নাম আবদুল মান্নান বলেও সে জানিয়েছিল। কিন্তু আমরা তার খৎনা করা হয়েছে কিনা পরীক্ষা করে দেখি। তারপর সব খেল খতম।"[৩৩] অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস লিখেছেন, "হিন্দুদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করা হচ্ছিল। কারণ শাসকগোষ্ঠী তাদেরকে মনে করত ভারতের অনুচর তারা পূর্ব বাংলার মুসলমানদের কলুষিত করে ফেলছে।" তিনি এই গণহত্যাকে একটি শোষণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেখেছেন। পাকিস্তানিরা পরিকল্পিতভাবে হিন্দু নিধনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজেছে।

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার আয়লা বিদ্যানগর গণহত্যা নিয়ে কাজ করেছেন তানভীর সালেহীন ইমন। তিনি লিখছেন, "ধর্মের ব্যবহারটা ছিল রাজনৈতিক কৌশল মাত্র। তারা পুরুষদের লুঙ্গি খুলে হিন্দু-মুসলমান শনাক্তকরণের মতো ঘৃণ্য কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি।"[৩৪] শরণার্থী হিসেবে পালানোর সময় হত্যার সবচেয়ে বড় উদাহারণ চুকনগর গণহত্যা। খুলনা-যশোর-সাতক্ষীরা জেলার নিকটবর্তী ভদ্রা নদীর কোল ঘেঁষে চুকনগরে খুলনা বাগেরহাটসহ এ অঞ্চলের হাজার হাজার পরিবার আশ্রয় নেয় একাত্তরের ১৯ মে। উদ্দেশ্য ছিলো পরদিন সকালে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা। কিন্তু পরদিন ২০ মে ঘটে সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক মানুষ হত্যার এক ভয়ঙ্কর হত্যাযজ্ঞ। একদিনে, একটিমাত্র জায়গায় যে বিপুলসংখ্যক মানুষকে হত্যা করা হয়, তার নজির ইতিহাসে নেই।

গণহত্যার অন্যতম লক্ষ্য হিন্দুরা। এটা বুঝতে পেরে ২৫ মার্চের পর থেকে বিপুল সংখ্যক হিন্দু দেশ ত্যাগ করতে শুরু করে। শরণার্থী হয়ে ভারতে যাওয়ার পথে অনেকেই হত্যা করেছে পাকিস্তানিরা। ১০০টি গণহত্যার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় শনাক্তকৃত ৫০১৩ জন শহিদদের মধ্যে ২১১৪ জন হিন্দু। যা গণহত্যায় শনাক্তকৃত শহিদের ৪২.১৭ শতাংশ।

সেই সময় বাংলাদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠী কত ছিল সেটা দেখার বিষয়। ১৯৬১ সালে পরিচালিত আদমশুমারিতে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু ছিল ৯৪ লক্ষ ৫ হাজার, স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ১৪ লাখ ৭৮ হাজার। তখন মোট মুসলমানের সংখ্যা ছিলো ৬ কোটি ১০ লাখ ৩৯ হাজার। আর হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিলো ৯৬ লাখ ৭৩ হাজার।[৩৫] যেটি মোট জনসংখ্যার ১৩.৫ শতাংশ অর্থাৎ ১৩.৫ শতাংশ হিন্দু জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪২.১৭ শতাংশ গণহত্যার মুখোমুখি হয়েছে। তাই

সাধারণভাবে ধরে নেয়া যায় গণহত্যায় ধর্ম একটি প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছে। সংগঠিত ১০০টি গণহত্যার কেস স্টাডিতে দেখা যায় ২৩টি গণহত্যায় শুধু টার্গেট করে হিন্দুদের হত্যা করা হয়েছে। গণহত্যায় হিন্দুদের লক্ষ্য করে হত্যার তীব্রতা আরো বাড়বে যদি শরণার্থীর বিষয়টা বিবেচনায় আনা হয়।

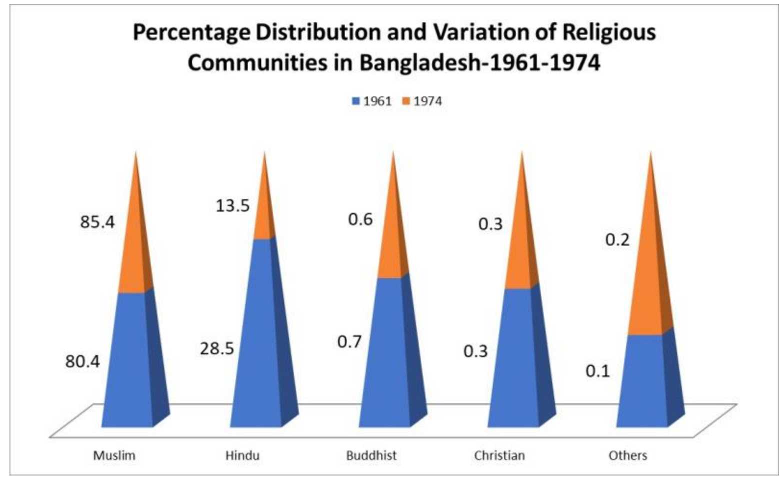

ছবি ২: শনাক্তকৃত শহিদদের ধর্মভিত্তিক বিভাজন

একাত্তরে প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় লিখেছিল যেটি ছিল মোট জনসংখ্যার সাত ভাগের এক ভাগ। বাংলাদেশ ডকুমেন্টসে আগস্টের মাঝামাঝি ৭৫.৫৬ লক্ষ আশ্রিত শরণার্থীর ধর্মীয় পরিচয় তুলে ধরেন। সেখানে বলা হচ্ছে হিন্দু ৬৯.৭১ লক্ষ, মুসলিম ৫.৪১ লক্ষ এবং অন্যান্য ০.৪৪ লক্ষ। সেই হিসেবে বলা যায় আশ্রিত এই এক কোটি শরণার্থীর মধ্যে ৯২ শতাংশ ছিল হিন্দু।[৩৬]

একাত্তরে যদি বাংলাদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হয় ৯৭ লক্ষ। তাহলে বাংলাদেশ ডকুমেন্টস এর তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৯২ লক্ষ হিন্দু ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। সমসাময়িক নানা গবেষণায় উঠে এসেছে আশ্রিত শরণার্থীদের মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ হিন্দু।[৩৭] সেই হিসাবে ধরে নেওয়া যায় কম করে হলেও ৬০ লক্ষ হিন্দু শরণার্থী হয়েছিল। অর্থাৎ অবরুদ্ধ বাংলাদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠী ছিল ৩৭ লক্ষ। গণহত্যার কেস স্টাডিতে প্রাপ্ত ফলে দেখা যাচ্ছে যায় প্রায় ৪২.১৭ শতাংশ হিন্দু গণহত্যায় প্রাণ হারিয়েছেন। অর্থাৎ অবরুদ্ধ

দেশের ৩৭ লক্ষ হিন্দুর মধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ হিন্দু প্রাণ হারিয়েছেন। প্রতি প্রায় প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন হিন্দু গণহত্যায় নির্মমতার স্বীকার হয়েছেন। পাকিস্তান আমলে পরিচালিত সর্বশেষ আদমশুমারিতে ১৯৬১ দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু জনগোষ্ঠী ১৮.৫ শতাংশ। স্বাধীনতার পর পরিচালিত প্রথম আদমশুমারী ১৯৭৪ এ স্বাভাবিক জনশুমারির সূত্র অনুযায়ী হিন্দু জনগোষ্ঠী হওয়ার কথা এক কোটি ৩২ লক্ষ। (কারণ এই শুমারিতে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা ৭ কোটি ১৪ লক্ষ ৭৮ হাজার, যার ১৮.৫ শতাংশ) কিন্তু হিন্দু জনগোষ্ঠীর প্রকৃত সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৬ লক্ষ ৫০ হাজার। যেটি গণহত্যায় পরিকল্পিতভাবে হিন্দু নিধনের উপাত্ত তুলে ধরে। দেশে হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা নেমে আসে ১৩.৫ শতাংশে। যদিও হিন্দু জনসংখ্যার এই হ্রাসকে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত বাংলাপিডিয়াতে দেশত্যাগের কারণ দেখানো হয়েছে। "...পাকিস্তান সরকারের নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংসতার কারণে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অনেকে ভারত চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।"[৩৮] কিন্তু এই কেস স্টাডিতে এটা স্পষ্ট এই হ্রাসের মূল কারণ গণহত্যায় হিন্দুদের লক্ষ্য করে হত্যা।

দিনাজপুরের নবাবগঞ্জের কাতলমারী গণহত্যার মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু নিধন। ঘোষলামপুর গ্রামে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোক বাস করত। কিন্তু এই দিন শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের উপর আক্রমণ করা হয়েছিল।[৩৯]

ঝালকাঠি সদরের গাবখান গ্রামে রাজাকাররা সারাদিন গ্রামে ঘুরে বেড়াত এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের কাউকে পেলেই হত্যা করতো।[৪০] গাবখান গণহত্যার উদ্দেশ্যও ছিল পরিকল্পিত হিন্দু নিধন। রাজশাহীর পবা উপজেলার পালপাড়া, তকিপুর, ময়মনসিংহের শালিহর, চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার মুজাফরাবাদ, রাউজানের ঊনসত্তরপাড়া, জগতমল্লপাড়া পরিকল্পিত হিন্দু নিধনের উদাহরণ।

ময়মনসিংহের শালিহর গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনী গ্রামে এসে জানতে চান কেউ হিন্দু আছে কিনা। নমশুদ্র পাড়ার রায় চরণ দাস, শচীন্দ্র দাস ও শত্রুঘ্ন শত্রুঘণ দাস হাত তুলে নিজের ধর্মীয় পরিচয় জানান দেয়। সাথে সাথে তাদের ওপর ব্রাশফায়ার করা হয়। মুহূর্তে তারা লাশ হয়ে পড়ে।[৪১] রাজশাহীর বাগমারার তাহেরপুর গণহত্যায় প্রকাশ্যে হাটের মধ্যে লক্ষ জনতার মাঝে হিন্দু সম্প্রদায়কে বেছে বেছে হত্যা করা হয়। গৌরচন্দ্র নামক এক লোককে ধরে পাকিস্তানি সেনারা বলে, কাপড় ওঠাও, কলেমা বলো।[৪২]

রাজশাহীর পবা উপজেলার তকিপুর গণহত্যা নিয়ে লেখক লিখেছেন, "হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যেই এই গণহত্যা ঘটানো হয়েছে।"[৪৩]

যশোর রেলস্টেশন মাদ্রাসা গণহত্যাটি একাত্তরের ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহন করে। ইসলাম ধর্মের দোহাই দিয়ে যে দেশ রক্ষা করার কথা বলেছিল পাকিস্তানি শাসকরা সেই ধর্মের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসার হাফেজ, মওলানা ও ইমামদের এখানে হত্যা করা হয়।[৪৪] জামিয়া এজাজিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসার শিক্ষক হাবিবুর রহমান এবং মাদ্রাসার তিন হাফেজ আবিয়ার রহমান, আবু দাউদ ও নোয়াব আলীকে গুলি করে হত্যা করে পাকিস্তান বাহিনী।

বরইতলা গ্রামের সব অধিবাসীই ছিল নিরীহ মুসলমান এবং মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহযোগিতা করত। পাকিস্তানি বাহিনী তাই নির্বিচারে সবাইকে গুলি করে হত্যা করেছে।[৪৫]

নওগাঁর দোগাছি গণহত্যায় গ্রামের মসজিদের মুয়াজ্জিনকে গলায় দড়ি বেঁধে গাছের সাথে ঝুলিয়ে হত্যা করে। দোগাছি গ্রামের পুকুরে কউকে ওজুরত অবস্থায় কাউকে নামাজরত অবস্থায় পাকিস্তানিরা ব্রাশফায়ার করে হত্যা করে।[৪৬] পাকিস্তানিরা অপপ্রচার চালাতো যে, তারা যা কিছু করছে ইসলামের জন্য করছে। কিন্তু ঝানজিরায় গণহত্যা চালানো হয়েছে পবিত্র রমজান মাসে, সেহরী খাওয়ার সময়। অনেকেই পালিয়ে ছিলেন, সেহেরি খাওয়ার জন্য ঘরে এসেছিলেন। পাকিস্তানি বাহিনী তাদের ধরে আগুনে পুড়িয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।[৪৭] পাশাপাশি হত্যা করা হয়েছে মুসলমানদের। সাচ্চা মুসলমান ও দ্বীন ইসলামের রক্ষক দাবিদার পাকিস্তানি বাহিনী নির্বিচারে নিরীহ মুসলমানদের শুধু হত্যাই করেনি তাদের লাশ পর্যন্ত দাফন করতে দেয়নি।[৪৮]

রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার বিড়ালদহ গণহত্যায় ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে পাকিস্তানি বাহিনী হত্যা করেছে। "পাকিস্তানিরা মুসলমানদেরকে হত্যা করবে না। এই বিশ্বাসে অনেকেই বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। তাদের সে বিশ্বাসকে ভূলুণ্ঠিত করে পাকিস্তানি বাহিনী।"[৪৯]

মাদ্রাসার মতো পবিত্র স্থানে পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ করবে না ভেবে এলাকার অনেক মানুষ এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের সে ধারণাকে পাকিস্তানি বাহিনী ভ্রান্ত প্রমাণিত করে।[৫০]

তবে মুসলমান পরিচয়ের কারণে গণহত্যা থেকে রেহাই পাওয়ার নজিরও দেখা যায়। মুন্সীগঞ্জের কেওয়ার গণহত্যার সময় পাকিস্তানি বাহিনী জিতু ভৌমিককে জিজ্ঞেস করে মুসলমান কিনা। কলেমা জানে কিনা তার স্কুলে ধর্ম

বিষয়ক শিক্ষা ছিল। তাই কলেমা জানত জিতু। মুসলমান পরিচয় দিয়ে বাঁচতে সক্ষম হন।[৫১]

কেস স্টাডিগুলোতে হিন্দুদের বাড়িঘর লুটের অনেকগুলো তথ্য পাওয়া যায়। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার বিনোদবাড়ি মানকোন গণহত্যায় দেখা যায় হিন্দুদের বাড়ি ঘর দখল করে নেয়া হচ্ছে। জোর করে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করা হচ্ছে। পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগীরা হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক বাড়ি দখল করে নেয় ও বহু হিন্দুকে নির্যাতন ও প্রাণহানির ভয় দেখিয়ে। পাকিস্তানি বাহিনী এদিন ঐসব এলাকার কয়েকটি গ্রামের কোন বাড়িঘর লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগ করতে বাদ রাখেনি। বর্বরতার সকল ইতিহাস ছাপিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যা, নির্যাতন, লুটপাট, অগ্নিসংযোগে পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যায় মুক্তাগাছার এই অঞ্চল। এদিন এলাকার তিন শতাধিক মানুষ গণহত্যার শিকার হন।

এই লুটপাটের সাথে জড়িয়ে ছিল হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করা। হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন ও ধর্মান্তকরণের মাধ্যমে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে মূলত হিন্দুদের মনে ভয় ধরিয়ে দেওয়া ছিল স্থানীয় সহযোগীদের মূল উদ্দেশ্য। যাতে হিন্দুরা পালিয়ে যায়। তারা দখল করে নিতে পারে শরণার্থী হওয়া হিন্দুদের বাড়িঘর, সম্পত্তি। খুলনার বটিয়াঘাটার বাদামতলা গণহত্যায় নির্যাতনের ধরন দেখেই মনে হয় তারা একটি গোষ্ঠীকে পরিকল্পিতভাবে নিঃশেষ করতে চেয়েছিল, যাদের আপাত লক্ষ্য ছিল সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দেশত্যাগে বাধ্য করা। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় খুলনায়ও হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের আক্রমণ করা হয়েছে, লুটপাট করা হয়েছে, স্থানান্তরে বাধ্য করা হয়েছে।

অনেকটা একই চিত্র দেখা যায় চট্টগ্রামের রাউজানের জগতমল্লপাড়া গণহত্যায়। গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী, ভুক্তভোগী ও স্বজনহারাদের স্মৃতিচারণে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে গণহত্যার মূল উদ্দেশ্য হিন্দু নিধন। কিন্তু হিন্দুদের উপর কেন এতো আক্রোশ জানতে চেয়েছিলাম তাদের কাছে। তাদের বয়ানে উঠে আসে ভিন্ন এক পটভূমি। মূলত সত্তরের নির্বাচনে ফজলুল কাদের চৌধুরী তার পরাজয় মেনে নিতে পারেননি। পরাজয়ের জন্য তিনি হিন্দুদের ভোটাধিকার প্রয়োগকেই কারণ হিসেবে নিবেচনা করেন। পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে ১৩ এপ্রিল জগতমল্লপাড়াসহ পুরো রাউজানে পরিকল্পিতভাবে হিন্দু নিধন চালানো হয়। গণহত্যায় নিহত সকলেই হিন্দু সম্প্রদায়ের।[৫২] গণহত্যার পর স্থানীয় সহযোগীরা এখানে লুটপাট চালিয়েছে। বেশ কয়েকটি নির্যাতনের ঘটনাও এই সময় ঘটেছে। পরবর্তীতে

নির্যাতিতদের অনেকেই ভয়ে ভারতে পাড়ি দিয়েছেন।

হিন্দু হওয়ার কারণে মুখোমুখি হতে হয় ভয়াবহ পাশবিক নির্যাতনের। নওগাঁর আতাইকুলা গণহত্যায় পাকিস্তানিরা নির্মমভাবে হত্যা করে গ্রামের অনেক নিরীহ মানুষকে। এদের মধ্যে ৫২ জনের পরিচয় জানা যায়। নিহতদের সবাই ছিলেন হিন্দু। পাকিস্তানিরা গ্রামে পাশবিক নারী নির্যাতন চালায়। মায়া বালার গর্ভে ছিল ৯ মাসের বাচ্চা। তার ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায় পাকিস্তানিরা। মায়া বালা বলেন, "আমার পেটে গুতা মারছে, উপুড় করে থুয়া পেটের ওপর লাথি মারছে, দুই তিন ঘর দাবড়ে আমাক অত্যাচার করছে।"[৫৩]

দামেরখণ্ড গণহত্যা ছিল পরিকল্পিত হিন্দু নিধনের অংশ। কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে তার ছক কষে আসে হত্যাকারীরা।[৫৪] গণহত্যার একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, সে কাছে আসলে বলেন তুই হিন্দু না মুসলমান? সে বলে মুসলমান। তখন রজ্জব আলী বলেন, লুঙ্গি উঠা। তারপর সে বলল, আমি নয়া মুসলমান। এ কথা বলার সাথে সাথে বুকে ধাক্কা দিয়ে কপালে গুলি করে রজ্জব আলী ফকির। সে পথের পাশে জলের মধ্যে গড়িয়ে পড়ে মারা যায়। এ সময় ধনখালীর গুরুদাস মাঝিকে গুলি করে হত্যা করে তারা। একই গ্রামের কালো মন্ডল অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দৌড়ে গিয়ে এক মুসলমান বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে সে মুসলমান হিসেবেই সেখানে রয়ে যায়।[৫৫] সেই বাড়ির পাশে এক হিন্দু বাড়ি ছিল। তারা নতুন মুসলমান হয়েছে।[৫৬] হিন্দুদের নির্যাতনের পাশাপাশি চালানো হয় লুটপাট। "ইচ্ছে মতো ঘরে থাকা থালা বাসন, চাল-ডাল, কাঁথা কাপড় যা পায় তাই নিয়ে চলে যেতে লাগল। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখি।"[৫৭] আন্ধারিয়া গ্রামের কালু মিয়া, লম্বা খোকা, সরদার বাড়ির ধলু সরদার, এজিদ খোকা এবং বহু স্থানীয় মুসলমান এসেছিল লুটপাট করতে। গলায় দা ধরে বলে, দলিল দে, জমি লিখে দে।[৫৮]

জগৎপুর গণহত্যায় আর্মিরা যেখানেই হিন্দুদের দেখছে, সেখানেই তাদের হত্যা করছে। মুসলীম লীগের সদস্যরা হিন্দুদের সাথে এমন আচরণ করছে যেন এ দেশ শুধু মুসলমানদের আর হিন্দুদের দেশ হলো ভারত।[৫৯]

সিলেটের পাঁচগাঁও গণহত্যায় স্থানীয় রাজাকাররা হিন্দু মহিলাদের ধর্ষণে নেতৃত্ব দেয়। নির্যাতিত নারীদের ভাষ্য থেকে জানা যায় স্থানীয় রাজাকার আলাউদ্দিন চৌধুরী, আব্বাস মেম্বার, আনাই ডাক্তার প্রমুখের নেতৃত্বে রাজাকাররা তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। শত অনুনয় বিনয়ের মাধ্যমে তাদের বিরত রাখা সম্ভব হয় নি। গ্রামের অনেক বাড়িতেই ধর্ষণের

ঘটনা ঘটে। কিন্তু কেউ তা প্রকাশ করতে রাজি হন নি। নারায়ন মালাকারের বাড়িতে একই পরিবারের তিন গৃহবধুকে ধর্ষণ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনের মাত্র এক মাসের একটি সন্তান মারা যাবার কয়েকদিন পরেই এই নির্যাতন করা হয়। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তিনি দুই দিন অজ্ঞান ছিলেন।[৬০] "নির্যাতনের পর রাজাকাররা আমাদের বাড়ি লুট করে চলে যায়। আমরা তিন বউয়ের অনেক সোনার গহনা ছিল। সবই রাজাকাররা নিয়ে গেছে। আমার ঘরে ১৫০ মন ধান ছিল। আলাউদ্দিন রাজাকার দা নিয়ে এসে আমার ভরাব কেটে সব চাল নিয়ে যায়। আমার ৩ টা ষাঁড় ছিল। সেগুলোও লুট করে নিয়ে যায়। আমার ঘরের দরজা পর্যন্ত খুলে নিয়ে যায়।"[৬১]

দেয়াড়া গণহত্যায় একাত্তরের এপ্রিল ও মে মাস জুড়ে খুলনাঞ্চলের হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর একের পর এক আক্রমণ ঘটেছে। লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের পাশাপাশি হিন্দু নারী বিশেষত যুবতী অবিবাহিত নারীদের অপহরণ ও নির্যাতন করা একটি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়।[৬২]

শ্রীরাম লক্ষীখালী গণহত্যায় যারা রজ্জব আলীর সাথে বাগেরহাট থেকে এসেছিল তারা বললো, "হিন্দু রাখা যাবে না। মালায়ন সব মারে ফেলতি হবে।"[৬৩] তখন 'নারায়ে তকবির, আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে রাজাকারদের সাথে শত শত লুঠকারী ঝাপিয়ে পড়ে লক্ষীখালির উপর।[৬৪]

ঠাকুরবাড়ির উত্তর পাশে সুকোমল মন্ডলদের বাড়ির বাগানে লুকিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে বহু মানুষ। তাঁদের টেনে বের করে সেখানে ছোরা রামদা-কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে এবং গুলি করে হত্যা করে ১২ জনকে। ওখান থেকেও কয়েকজন মহিলাকে ধরে নিয়ে যায় রাজাকার বাহিনী। সুরেন মজুমদারের মেয়ে অঞ্জলি মজুমদার। তার বাবাকে গুলি করে মেরে তাকে ধরে নিয়ে যায় বাগেরহাট। "আমাদের সাথে ১৫-১৬ জন মেয়ে ছিল।" প্রমিলা শিকারী জানান, তাকে বাগেরহাট ধরে নিয়ে যায় নি বটে কিন্তু দুর্বার নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তার সাথে থাকা শেফালি মৃধাও নির্যাতনের শিকার হন।[৬৫] লক্ষীখালী গণহত্যার সময় বহু নারী নির্যাতিত হন এবং অনেককে বাগেরহাট নিয়ে নির্যাতন করা হয় দিনের পর দিন। ডুমুরিয়ার পূর্ণিম বৈরাগীর ১২ বছরের মেয়ে সনেকা বৈরাগীকেও ধরে নিয়ে যায় বাগেরহাট; স্বাধীনতার পর সে ফিরে আসে।[৬৬] মিটিং থেকেই তারা দলবদ্ধ হয়ে তৎকালীন মিঠাখালি, জিউধরা, বহরবুনিয়া, বিভিন্ন হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় আক্রমণ চালাতে শুরু করে। তারা গরু ছাগল, ধান-চাল, সোনাদানা, হাঁস-মুরগি, চাল-ডাল, পুকুরের মাছ এমনকি ফলের গাছ পর্যন্ত লুট করে নিয়ে যায়। বিভিন্ন স্থানে লুটপাট শুরু করল এবং হিন্দুদের শিক্ষিত সুন্দরী মেয়েদের ধরে নিতে

লাগল।[৬৭] "কিছু মুসলমান হিন্দু মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। আমার তখন বিয়ে হয় নি। তবু শাঁখাসিঁদুর পরে ঘোমটা দিয়ে থাকতাম। আমাদের বাড়ি পাহারা দিত বহু মুসলমান লোকজন। তারা আমাদের সাথে করে নিয়ে গেল।"[৬৮] "কারো কান ছিড়ে নিয়ে যায়, কারো হাত কেটে নিয়ে যায়, কারো মেয়ে ধরে নিয়ে যায়। রাতে আর ঘুমাতে পারি না।"[৬৯] "কেবল উত্তর পাশে জনার্দন হালদারের বাড়ি এক জনকে ২২ টা কোপ দিয়েছে। সে তখনও মরেনি। তার পেট থেকে সদ্য খাওয়া ভাত বেরিয়ে পড়েছে।"[৭০]

ঝাড়ুয়ার বিল গণহত্যায় বর্বর পাকিস্তানিদের হাত থেকে ৫ বছরের শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ কেউ রেহাই পায় নি। সেখানে গুলি করে হত্যা করা হয় প্রায় দেড় সহস্রাধিক মানুষকে। বাচ্চু খান চিৎকার করে সবাইকে লাইনে দাঁড়াতে বলে। এক লাইনে হিন্দু, এক লাইনে ছাত্র ও আরেক লাইনে যুবক। ট্রেনের কাছে নেওয়ার পর সবাই আসরের নামাজ পড়ার অনুরোধ করেন। জানের ভয়ে হিন্দু মুসলমান সবাই নামাজ পড়েছিলেন সেদিন।[৭১] তখন হিন্দু মুসলীম সবাই নামাজ পড়ে পাকিস্তানি সৈন্যর হাত থেকে প্রানে বাঁচার জন্য। কারণ পাকিস্তানি সৈন্যরা কেউ হিন্দু না মুসলমান তা রাস্তায় ধরে ধরে পরীক্ষা করত।[৭২]

রমানাথপুর গণহত্যায় বেশ কিছু নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। তবে তার অধিকাংশই হিন্দু পরিবারের মা-বোনদের সাথে সংঘটিত হয়েছিল। এরা বেশির ভাগই মারা গেছেন, কেউ কেউ ভারতে চলে গেছেন।[৭৩] যেহেতু গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ বেশি ছিল না তাই লুটতরাজের ঘটনাও কম ঘটেছে। তবে যখন এসব হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ গ্রাম ছেড়ে পালতো তখন স্থানীয় কিছু লুটেরা বাহিনী ও রাজাকার বাহিনীর লোক এসব নিরীহ মানুষদের ধরে তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিত।[৭৪] রমনাথপুরের উত্তরের দিকের রাস্তার আশে পাশের বেশ কিছু বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। তবে গ্রামের ভেতরে সেভাবে ঘটেনি। লুটপাটের ঘটনাও হিন্দু বাড়িতেই বেশি হয়, মুসলমানদের বাড়িতে তেমন ভাবে এসব ঘটনা ঘটেনি।[৭৫]

গবেষক এম এ হাসান দীর্ঘদিন ধরে একাত্তরের গণহত্যা ও নির্যাতন নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি পরিকল্পিত এই হিন্দু নিধনের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। লিখছেন, পাকিস্তানিরা হিন্দুদেরকে রক্তচোষা নোংরা জীব, বিষাক্ত সাপ ও জন্মবেঈমান বলে মনে করত। এদের পাকিস্তানিরা বিবেচনা করত জন্মগত শত্রু ও বাংলাদেশ সৃষ্টির উদ্যোক্তা হিসেবে।[৭৬] হিন্দুদের টার্গেট করে হত্যার পেছনে আরেকটি বড় কারণ উঠে আসে এম এ হাসানের গবেষণায়, সেটি হল লুট করা। যাদেরকে হত্যা করা

হয়েছে তাঁদেরকে সবসময় হত্যার জন্যই হত্যা করা হয়েছে এমন নয়। বিপুলসংখ্যক বাঙালি, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদেরকে হত্যা করা হয়েছে তাঁদের সম্পদ লুট করা হয়েছে।[৭৭]

গণহত্যার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এটি একটি নির্দিষ্ট ধর্মালম্বীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার অভিপ্রায়ে সংঘটিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসীদের বর্বরতার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইহুদিদের নিশ্চিহ্ন করা। ঠিক তেমনি একাত্তরে অনুরূপ হিংস্র ধর্মীয় বিদ্বেষ দেখিয়েছেন পাকিস্তানিরা। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী ও তাদের সেনাবাহিনী অল্পভাবে বিশ্বাস করত যে, হিন্দু মাত্রই ভারতের দালাল এবং কাফের।[৭৮]

এরা স্বধর্মচ্যুত আওয়ামী নেতাদের প্রভাবিত করে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বিনাশের ষড়যন্ত্র করছে। তারা স্থির বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিল, বাঙালির তথাকথিত স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করতে হলে পূর্ব পাকিস্তানকে প্রথমে হিন্দু শূন্য করতে হবে।[৭৯] ফলে অপারেশন সার্চলাইটের শুরুতে পরিকল্পিতভাবে হিন্দু নিধন শুরু করা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত কিশোরী-তরুণী-যুবতীদের গণিমতের মাল গণ্য করে ভোগ্যপণ্য হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়।

ফলে হিন্দু সম্পদায়ের নারীর শিকার হয় জেনোসাইডাল রেপের। একাত্তরে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতি দশজনে একজন ছিল হিন্দু। কিন্তু একাত্তরে ধর্ষিত নারীদের বড় একটি অংশ ছিল হিন্দু। গণহত্যার কেস স্টাডিগুলোতে দেখা যাচ্ছে শুধু হিন্দু হওয়ার কারণে বিপুল সংখ্যক নারীকে ধর্ষিত হতে হয়েছে। বাগেরহাটের শ্রীধাম লক্ষীখালী গণহত্যায় দেখা যায়, হিন্দু হওয়ার অপরাধে প্রায় ২০ জন নারীকে ধর্ষণ করা হয়। সুরেন মজুমদারের মেয়ে অঞ্জলী মজুমদার। তাঁর বাবাকে গুলি করে হত্যার পর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বাগেরহাটে। পূর্ণিমা বৈরাগীর ১২ বছরের মেয়ে সন্ধা বৈরাগীকেও বাগেরহাট নিয়ে যাওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় ধর্ষিত হওয়াটাই ছিল তাদের ভাগ্যের লিখন।[৮০] সিরাজগঞ্জ সদরের হরিণাগোপাল-বাগবাটি গণহত্যার গবেষক সুস্মিতা দাস গণহত্যার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখছেন, সেদিন পাকিস্তানি বাহিনী আট-দশ জন নারীকে ধর্ষণ করে। ধর্ষিতাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল হিন্দু যুবতী ও সদ্য বিবাহিতা।[৮১] আবার কয়েকটি গণহত্যায় দেখা গেছে হিন্দু নারী হওয়ার কারণে গণধর্ষণ করা হয়েছে। পাবনার আটঘরিয়া উপজেলার লক্ষীপুর গণহত্যায় দেয়া যায় পাকিস্তানি হানাদাররা নরেশ চন্দ্র দাসকে হত্যা করে তার স্ত্রী উর্মিলা রাণীকে গণধর্ষণ করে। ৫-৬ জন মিলে পাশবিক নির্যাতন করলে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

হানাদাররা ঘটনাস্থল থেকে চলে যাওয়ার পর উর্মিলা রাণী দাসকে উদ্ধার করে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।[৮২]

একই সাথে কানাইলাল দাস ও সদানন্দ করের মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়। কাউকে বাড়িতে, কাউকে পানের বরজে আবার কাউকে বাঁশঝাড়ে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়। হিন্দু নারীদের ধর্ষণের অভিপ্রায়ে রাজাকাররা পাকিস্তানি বাহিনীকে হিন্দু পাড়ায় নিয়ে যাওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায় কয়েকটি গণহত্যা।

একাত্তরে মোট ধর্ষিতাদের ৪২ ভাগই ছিলেন হিন্দু ধর্মালম্বীরা এই হিন্দু নারীদের মধ্যে ৪৪ ভাগ ছিলেন কুমারী। অর্থাৎ পাকিস্তানি বাহিনীর ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন।[৮৩] মুক্তিযুদ্ধেকে আমরা জনযুদ্ধ বলি। পরিকল্পিতভাবে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করা হয়েছে হিন্দু হওয়ার কারণে। কেস স্টাডিতে দেখা গেছে ৩৫টি গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে হিন্দু বলে। হিন্দু পাড়াগুলোতে গণহত্যা চালানোর পর আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। এর মূল কারণ ভয় ধরিয়ে দেয়া ও লুটপাট করা।

হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, লুটতরাজ কিংবা বন্দিত্ব সব মিলিয়ে একাত্তরে এদেশের হিন্দুদের জীবনে নরক নেমে এসেছিল। কেস স্টাডিতে ব্যবহৃত ১০০টি গণহত্যার ঘটনার মধ্যে চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার জগতমল্লপাড়া ও উনসত্তরপাড়া গণহত্যার গবেষণা কাজে ২০১৩ সালে আমি ও আমার গবেষণা তত্ত্বধায়ক ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন গণহত্যার জায়গাগুলোতে যাই। কথা বলি গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী ও স্বজনহারাদের সাথে। একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধে যুক্ত থাকার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া ঘাতক সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরী ও তার বাবা ফজলুল কাদের চৌধুরীর নির্দেশে কি ভয়াবহ হিন্দু নির্যাতন এখানে হয়েছে তা অকল্পনীয়। শুধু হিন্দু হওয়ার কারণে একাত্তরের ১৩ এপ্রিল ৯টি গ্রামে তান্ডব চালায় পাকিস্তানি বাহিনী। এখানে চালানো হয় পরিকল্পিত হিন্দু নির্ধন, জগতমল্লপাড়া গণহত্যায় দেখা যায় নিহতদের সকলেই হিন্দু, গণহত্যার পর এখানে হিন্দু নারীদের ধর্ষণ করা হয়েছে। রাজাকাররা এখানে লুটপাট চালিয়েছে।[৮৪] মৌসুমী রহমান কাজ করেছেন নওগাঁর রানীনগর উপজেলার আতাইকুলা গণহত্যা নিয়ে। গবেষক তুলে ধরেছেন আতাইকুলায় হিন্দুদের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতনের বিবরণ। গ্রামে এমন কোন হিন্দু প্রাপ্ত বয়স্ক নারী ছিলেন না যিনি ধর্ষিত হননি।[৮৫]

একাত্তরে হিন্দু নির্যাতনের পেছনে বড় একটি কারণ ছিল হিন্দুদের সম্পত্তি লুট করা। বাগেরহাটের শ্রীধাম লক্ষীখালী গণহত্যায় লুটপাটের বর্ণনা উঠে এসেছে, "মিটিং থেকেই তারা দলবদ্ধ হয়ে তৎকালীন মিঠাখালী,

জিউধরা, বহরবুনিয়া বিভিন্ন হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় আক্রমণ চালাতে শুরু করে। তারা গরু ছাগল, ধান-চাল, সোনাদানা, হাঁস-মুরগি, চাল-ডাল, পুকুরের মাছ এমনকি ফলের গাছ পর্যন্ত লুট করে নিয়ে যায়।"[৮৬] আর এই লুটপাট চালিয়ে রাজাকাররা, বিহারিরা। "তখন নারায়ে তকবির, আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে রাজাকারদের সাথে শতশত লুটকারী ঝাঁপিয়ে পড়ে লক্ষীখালির উপর।"[৮৭]

একাত্তরে পাকিস্তানী প্রশাসক ও সেনা কর্মকর্তাদের এই ধর্মীয় বিদ্বেষের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উঠে এসেছে মুনতাসীর মামুনের *পাকিস্তানি জেনারেলদের মন বাঙালি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ* গ্রন্থে। লেখক একাত্তরের গণহত্যায় সম্পৃক্ত অনেকের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এবং এসব নীতি নির্ধারকদের ৭ জনের আত্মজীবনী বিশ্লেষণ করে গ্রন্থটি লিখেছেন। মুনতাসীর মামুন লিখেছেন, জেনারেলদের আলোচনা, মনোভঙ্গি থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ভারত বা হিন্দুদের তারা পাকিস্তানের শত্রু বলে মনে করত।[৮৮] বাঙালি ও হিন্দুদের তারা সমর্থক বলে মনে করেছেন। হিন্দুদের প্রতি পাকিস্তানি জেনারেলদের প্রচণ্ড বিদ্বেষের কারণটি স্পষ্ট করে মুনতাসীর মামুন লিখছেন, "বাঙালিদের মনমানসিকতা প্রভাবিত করেছিল হিন্দুরা"। ফলে বাংলাদেশের হিন্দুরা এখনকার মুসলমানদের মনে একটি ভারতীয় সফট কর্ণার তৈরি করেছে। তারা ভারতীয়দের মতো সবসময় পাকিস্তানের বিনাশ চেয়েছে। মুনতাসীর মামুন জেনারেল ফজল মুকিব খানের 'ক্রাইসিস ইন লিডারশিপ' গ্রন্থটির বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন শুধু যারা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী তারা নয়। পাকিস্তানিরা সকল বাঙালিদের হিন্দু মনে করত। পূর্ববঙ্গের স্কুল কলেজগুলোতে হিন্দু অধ্যায়নে, হিন্দু শিক্ষদের যাওয়া ভারতীয় পাঠ্যপুস্তক পড়ানো হত। যেগুলো ভারতীয় প্রোপাগান্ডায় ভরা। ফলে পাকিস্তানের কোনো চেতনা পূর্ববঙ্গের তরুণ জেনারেশনের মধ্যে জাগেনি, ইস্ট পাকিস্তানের মুসলমানরা পরিণত হলো বাঙালিতে। আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল হিন্দু মন্দির, মূর্তি। হিন্দু সম্প্রদায়ের যারা নানা ধরনের বুদ্ধিভিত্তিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত তাদেরও হত্যা করা হয়েছে। প্রায় ১৮টি গণহত্যায় হিন্দু মন্দির আক্রমণ, মূর্তি ভাঙ্গা, অবমাননার বিবরণ পাওয়া যায়। চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার মুজাফফরাবাদ কিংবা রাউজানের জগতমল্লপাড়ার নুতন চন্দ্র সিংহের বাড়ি, মন্দির, মূর্তি কেউই রেহাই পায়নি। শ্রীধম লক্ষীখালী গণহত্যায় দেখা যায় আক্রমণকারীদের মূল ক্ষোভ ছিল ঠাকুরবাড়ির উপর। প্রথমে সেখানে গিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। ঠাকুরবাড়িতে লোকজন ছিল না। মাতুয়া ভক্ত হিরামন গোঁসাই গোপালচাঁদসাধু ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ

করে তাঁর ছবির সামনে নাট মন্দিরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ওইভাবে পড়েছিলেন। এক কোপে তার গলা কেটে ফেলে রাজাকাররা। মস্তক-বিচ্ছিন্ন ধড়ের সাথে সাধুর প্রিয় একতারাটি তার বগলে তখনও ধরা ছিল! একটা কুকুর বাঁধা ছিল উঠোনে। তারা কুকুরটিকে গুলি করে এবং বেধড়ক পিটিয়ে হত্যা করে। ভাঙ্গচুর করে মন্দিরের মূর্তি।

একাত্তরের ২৯ জুন আনর্ল্ড জেথলিনের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে মার্কিন দৈনিক *ডেইলি আমেরিকান*। প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন কিভাবে পরিকল্পিতভাবে হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছে। "মুসলমান অধিবাসীরা জানিয়েছে, এলাকাটিতে প্রায় ১০০টি হিন্দু পরিবার অর্থাৎ কমপক্ষে ৫০০ জন হিন্দু ছিল। যাদের হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু মুসলমানরা অক্ষত আছেন।"[৮৯]

ডা. এম এ হাসান বাংলাদেশ গণহত্যার শ্রেণি, লিঙ্গ ও পেশা ভিত্তিক বিশ্লেষণে গণহত্যার প্রধান লক্ষ্য হিসেবে ৭টি শ্রেণির কথা উল্লেখ করেছেন। তার একটি তরুণ সাধারণ ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় আরেকটি ব্যাপক হিন্দু সম্প্রদায়।[৯০]

যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তাঁদেরকে সবসময় হত্যার জন্যই হত্যা করা হয়েছে এমন নয়। বিপুল সংখ্যক বাঙালি, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদেরকে হত্যা করা হয়েছে তাদের সম্পদ লুট করার জন্য।[৯১]

আফসান চৌধুরী *হিন্দু জনগোষ্ঠীর একাত্তর* বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, "পাকিস্তানীদের চোখে কারা প্রধান শত্রু ছিল, সেটা বোঝার অন্যতম উপায় ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ রাতে তাদের আক্রমণের স্থানগুলো লক্ষ্য করা।"[৯২]

তিনি উল্লেখ করেছেন অপারেশন সার্চলাইটের শুরুতে যে পাঁচটি জায়গায় আক্রমণ করা হয়েছে তিনটিই ছিল অরাজনৈতিক হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর। এর কোনটিকেই কোন প্রতিরোধ হয়নি। আফসান চৌধুরী লিখছেন, 'পাকিস্তানি আক্রমণকারীদের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক বা সশস্ত্র শক্তির পাশাপাশি, কেবল ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে, হিন্দু জনগোষ্ঠীর মানুষেরা শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।' ফলে ২৫ শে মার্চের কালো রাতে সশস্ত্র প্রতিরোধের কেন্দ্র রাজারবাগ ও পিলখানা কিংবা আন্দোলনের সুতিকাগার ইকবাল হল (জহুরুল হক হল) ছিল তাদের টার্গেট, পাশাপাশি টার্গেট ছিল হিন্দু অধ্যুষিত জগন্নাথ হল, শাঁখারী বাজার, রমনার কালী মন্দির।

পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দুদের বেশ কয়েকটি প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। কেস স্টাডিতে উঠে আসা কয়েকটি প্রতিবন্ধকতা

তুলে ধরা হল।

১. লুঙ্গি উচিয়ে ধর্মীয় পরিচয় নিশ্চিত হওয়া ছিল হিন্দুদের প্রতি পাকিস্তানীদের সবচেয়ে পরিচিত নির্যাতন। একাত্তরে শত শত হিন্দুকে প্রাণ দিতে হয়েছে ধর্ম পরীক্ষার এই নগ্ন পরীক্ষায় ফেল করে।
২. ধর্ম যাচাইয়ের জন্য কালেমা পড়তে বলেছে।
৩. হিন্দু নারীদের গণহারে ধর্ষণ করা হয়েছে।
৪. বিভিন্ন ক্যাম্পে হিন্দু নারীদের আটকে রক্ষিতা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।
৫. হিন্দু বাড়িঘর লুটপাট করা হয়েছে। কেস স্টাডিতে উঠে এসেছে চাল-ডাল থেকে শুরু করে গৃহস্থালি জিনিস, মূল্যবান সামগ্রী, গরু-ছাগল সবকিছুই লুটপাট হয়েছে। এমনকি মুসলমানরা হিন্দুদের জমির ধান পর্যন্ত কেটে নিয়ে গেছে।
৬. জায়গা জমি, বাড়িঘর দখল করে দলিল করে নিয়েছে।
৭. মুসলমান হতে বাধ্য করেছে।
৮. হিন্দু মেয়েদের জোর করে ধর্মান্তকরণ করে মুসলমান ছেলেদের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আর উদ্বাস্তু হওয়ার যে পরিণতি সেটা তো ছিলই। একাত্তরের পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের জীবনে ২টি নিয়তি ছিল। হয় মরো, না হয় পালাও। কেউ বেঁচে নিয়েছিল শরণার্থী জীবন। কেউই বরণ করেছে গণহত্যার পরিণতি। আবার অনেকেই অস্ত্র হাতে শামিল হয়েছিল প্রতিরোধে।

কেস স্টাডিতে পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পেতে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দুদের বেশ কয়েকটি কৌশল অবলম্বনের তথ্য পাওয়া যায়।

যেমন—

১. হিন্দুদের ঐতিহ্যগত পোশাক ধুতি ও পাঞ্জাবীর পরিবর্তে লুঙ্গি, শার্ট, প্যান্ট পরিধান করা।
২. ভয়ে হিন্দু মহিলারা মাথায় সিদুঁর দেয়া ও হাতে শাঁখা পড়া বন্ধ করে দেয়।
৩. মাথায় টুপি পড়া।
৪. দাড়ি রাখা।

৫. বিধবার বেশ ধারণ করে, সাদা শাড়ি পরিধান করা।
৬. নামাজ পড়া।
৭. সাময়িক সময়ের জন্য মুসলমান হয়ে যাওয়া।

যদিও এই সব কৌশল ব্যবহার করেও তারা মৃত্যু এড়াতে পারেন নি। তবে কেস স্টাডিতে পর্যবেক্ষণ করা গণহত্যাগুলোর কয়েকটিতে এসব কৌশল ব্যবহার করে পাকিস্তানী বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ গণহত্যায় হিন্দুদেরকে টার্গেট করে হত্যা করা হয়েছে এটা অধিকাংশ গবেষকই স্বীকার করতে চান না। আমরাও এটাকে মেনে নিতে পারি না। একাত্তরের জনযুদ্ধ ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সবাই প্রাণ হারিয়েছে সন্দেহ নাই। কিন্তু একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে পরিকল্পনা করে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পাকিস্তানি চক্রান্তটিকে অস্বীকার করার উপায় নেই, এই অস্বীকারের মধ্যে কোন গৌরব নেই।

আমাদের মানস জগতে আধিপত্য বিস্তার করে আছে সাম্প্রদায়িকতা, আরো স্পষ্ট করে বললে আমাদের মানস জগতে এখনো সাতচল্লিশের দেশভাগের প্রাধান্য, একাত্তর এখানে উপেক্ষিত। সেই মানস দিয়ে একাত্তরে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভূমিকাকে আমরা মূল্যায়ন করি। স্বাধীনতার জন্য এই একটি সম্প্রদায়কে কি পরিমাণ আত্মত্যাগ করতে হয়েছে সেটা আমরা বিবেচনা করি না। এটা আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানস জগতের সীমাবদ্ধতা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিন্দুরা কতটা শত্রুপক্ষের টার্গেট ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের গোপন টেলিগ্রাফে। একাত্তরের ৩১ মার্চ প্রেরিত সেই বার্তায় বলা হচ্ছে, "Hindus undeniably special focus of military brutality. Several large fires witnessed night of March 30-31. Shots heard emanating from on burning area. Congen locals say most of these areas predominently Hindu."

১৯৭১ সালের নভেম্বরে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি মার্কিন সিনেটে তুলে ধরেন কীভাবে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের ওপর পরিকল্পিত নির্যাতন করা হচ্ছে।

"Hardest hit have been members of the Hindu community who have been robbed of their lands and shops, systematically slaughtered, and in some places, painted with yellow patches

marked 'H'."[৯৩]

এবং তিনি উল্লেখ করেছেন এই পরিকল্পিত হিন্দু নিধন ইসলামবাদের সামরিক শাসকদের আদেশে, তাদের অনুমোদনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক আর জে রামেল স্পষ্ট করেছেন বাঙালীদের প্রতি বিশেষ করে হিন্দুদের প্রতি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মানসিকতা বা চিন্তাটা কি।

"The genocide and gendercidal atrocities were also perpetrated by lower-ranking officers and ordinary soldiers. These 'willing executioners' were fueled by an abiding anti-Bengali racism, especially against the Hindu minority. "Bengalis were often compared with monkeys and chickens. Said General Niazi, 'It was a low-lying land of low-lying people.' The Hindus among the Bengalis were as Jews to the Nazis: scum and vermin that [should] best be exterminated. As to the Moslem Bengalis, they were to live only on the sufferance of the soldiers: any infraction, any suspicion cast on them, any need for reprisal, could mean their death. And the soldiers were free to kill at will. The journalist Dan Coggin quoted one Pakistani captain as telling him, 'We can kill anyone for anything. We are accountable to no one.' This is the arrogance of Power."[৯৪]

২ আগস্ট ১৯৭১ *টাইম* ম্যাগাজিনে "The Raw Aging of Godden Bengal" শিরোনামে লিখছে, "The Hindus, who account for three-four of the refugees and a majoring of the dead, have borne the brunt of the Muslim military hatred." (মুসলিম মিলিটারি মানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বুঝানো হয়েছে।) আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একটি বিশেষভাবে নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিমূলক চিত্র উপস্থিত করা। ১৯৭১ সালে সবাই নির্যাতিত হলেও হিন্দু জনগোষ্ঠী অধিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর কারণ জাতিগোষ্ঠীর পরিচয় হিসেবে পাকিস্তানের কাছে তারা ছিল বিশেষভাবে শত্রুস্থানীয়।[৯৫]

সারা বাংলাদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর যে নির্যাতনগুলো হয়েছে তার উদ্দেশ্য প্রধানত সন্ত্রাস সৃষ্টি করা, যাতে করে হিন্দুরা দেশ ছেড়ে চলে যায়। পাকিস্তানিদের কাছে হিন্দু জনগোষ্ঠী ও ভারতীয়রা সমার্থক ছিল বলে

প্রতীয়মান হয়। এ কারণে এটি জাতি গোষ্ঠীভিত্তিক নিধন কাজ বা গণহত্যা বলা যায়। ঢাকায় বেশ কিছু বস্তিতে আগুন দেওয়া হয়, যার মধ্যে মগবাজারের বেগুনবাড়ি খালের পাশে অবস্থিত পালপাড়া উল্লেখযোগ্য। এখানে কেবল হিন্দুদের বসবাস ছিল।[৯৬]

একাধিক কারণেই হিন্দুরা শত্রু ছিল এবং তাদের ওপরে নির্যাতন করা ছিল সবচেয়ে নিরাপদ। কারণ তাদের সামাজিক কাঠামো সবল ছিল না। যারা এ দেশে থেকে গিয়েছিল, তারা তেমন এলাকার মানুষ, যাদের এলাকায় রক্ষা করার মতো প্রভাবশালী ছিল বা যেসব এলাকায় পাকিস্তানি আর্মিরা যায়নি। কিছু কিছু হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়েও বিপদ কমানোর চেষ্টা করেছিল। পাকিস্তানের এই হিন্দু নীতির একাধিক উদ্দেশ্য ছিল হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনের মাধ্যমে হিন্দুদের দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা এবং হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের মাধ্যমে পাকিস্তানের শত্রু হিসেবে 'বিকল্প ভারতীয়দের' ওপর এক ধরণের প্রতিশোধ নেওয়া। হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের 'শত্রু ধর্ম' হিসেবে নির্যাতন ও হত্যা করা। এ কারণেই হিন্দুদের ওপর গণহত্যা ও নির্যাতনকে 'ধর্মযুদ্ধের' সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়। এর ফলে ভারতের সাথে রাজনৈতিক যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধে পরিণত হয়।[৯৭]

"আমাদের গ্রামে মাইকে ঘোষণা দিয়েছিল, আপনারা যদি বাঁচতে চান, তাহলে দুই দিনের মধ্যে মুসলমান হতে হবে। ধামরাইয়ের বাজার মসজিদে লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে মুসলমান করেছিল আমাদের। মুসলমান করে মসজিদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে নামাজ পড়িয়েছে। অজু করা শিখিয়েছে। কালেমা পড়া শিখিয়েছে। তারপরে একটা করে বই দিয়ে দিয়েছিল। এইটা আমাদের জন্য ভালোই হয়েছিল। মুসলমান হওয়ার জন্য আমরা প্রাণে বেঁচে যাই। স্বাধীন হওয়ার পরেই আবার হিন্দু হয়ে যাই।"[৯৮] রাজাকার যারা, লুটেরা যারা, তারা নিকৃষ্টভাবে লুট করেছে। শ্বেতপাথরের নকশা করা মন্দিরের মূর্তিগুলোও লুট করে নিয়ে গেছে।[৯৯]

বাংলাদেশ একাত্তরের একটি বড় বাস্তবতা হচ্ছে হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতন এবং পরিণামে বাধ্য হয়ে দেশত্যাগ। বেশির ভাগ জনগোষ্ঠী গিয়ে আশ্রয় নেয় ভারতে। কিন্তু সবার জীবন ছিল অসহায় এবং সার্বক্ষণিক বিপদের মধ্যে বসবাস। এর ফলে পালিয়ে যাওয়া, নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান ছিল সকলের জন্য বাস্তবতা। এই বিপদ ছিল হিন্দু জনগোষ্ঠীর মানুষের জন্য অধিক।[১০০] আর্চার কে. ব্লাড বলেছিলেন, "Genocide' applies fully to [this] naked, calculated and widespread selection of Hindus for special treatment…From outset various members of American

community have witnessed either burning down of Hindu villages, Hindu enclaves in Dacca and shooting of Hindus attempting [to] escape carnage, or have witnessed after-effects which [are] visible throughout Dacca today."[১০১]

সিদ্ধান্তসমূহ:

কেস স্টাডিতে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তগুলো বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ গণহত্যার একটি বাস্তব চিত্র কল্পনা করা যায়। প্রথমত এই গণহত্যায় হিন্দুদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। যেখানে প্রায় ৮৫ শতাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি ৩৪ জনে একজন গণহত্যায় নিহত হয়েছেন, সেখানে প্রায় ১৪ জন হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে। যেটি পরিকল্পিত হিন্দু নিধনের প্রমান দেয়। যদিও ১২ লক্ষ হিন্দুর পাশাপাশি প্রায় ১৮ লক্ষ মুসলমানদেরও এই গণহত্যায় হত্যা করা হয়েছে।

আয়লা বিদ্যানগর গণহত্যায় হত্যা করা হয়েছে জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে। এখানে যেমন গুলি করে হত্যা করা হয়েছে নরেন্দ্র নাথকে, আবার ৭০ বছর বয়সী ধর্মপ্রাণ মিয়া হোসেন কিংবা আব্দুল জব্বারকেও সেই নির্মমতা থেকে রেহাই দেয়নি। ধর্মের কথা বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী মুখে যতই বলুক বাস্তবে কাউকে ছাড় দেয়া হয়নি। বরং ধর্মের ব্যবহারটা ছিলো রাজনৈতিক কৌশল মাত্র। তারা পুরুষদের লুঙ্গি খুলে হিন্দু-মুসলমান শনাক্তকরণের মতো ঘৃণ্য কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি।[১০২]

একাত্তরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীরা পরিকল্পিতভাবে একটি সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছেন। এরই অংশ হিসেবে চালিয়ে পরিকল্পিত গণহত্যা। পাশাপাশি মুসলমানদেরও তারা নির্বিচারে হত্যা করে। 'যে বুড়ো লোকটি কারফিউ উপেক্ষা করে জুমার নামাজকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল তাকে মসজিদে ঢোকার পথে গুলি করে মারা হয়।[১০৩] গবেষক আবুল বাশার বরিশালের বানারীপাড়ায় গাভা-নরের কাঠী গণহত্যার মূল্যায়নে লিখছেন, 'হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনকে প্রথমে টার্গেট করে। পরে নির্বিচারে বাঙালিদের উপর গণহত্যা পরিচালনা করে'।[১০৪] পাকিস্তানিরা মূলত পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের প্রকৃত মুসলমান মনে করতেন না। এরা হিন্দু পাড়ার মুসলমান বলে ঠাট্টা করতেন। একাত্তরে তারা আমাদের প্রকৃত মুসলমান বানাতে চেয়েছিল। এরই অংশ হিসেবে শোধন প্রক্রিয়া হাতে নেয়, নির্বিচারে হত্যা করে হিন্দুদের। এই হিন্দু মানে শুধু হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা নয়, তাদের দৃষ্টিতে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবান্বিত সকলকেই তারা হত্যা করতে চেয়েছে।

নিয়াজির গণহত্যার ব্লুপ্রিন্ট বিশ্লেষণ করে মুনতাসীর মামুন লিখছেন, 'বাঙালিদের কমপক্ষে বছর দশেক মগজ ধোলাই করতে হবে যাতে আবেগজাত দিক থেকে তারা পশ্চিমবঙ্গ (অর্থাৎ হিন্দু) থেকে আলাপ হিসেবে নিজেদের মনে করে। তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর সময় এখন আসেনি, তার ভাষায়— There must be more killing, more mopping up and more witch hunting.[১০৫]

হিটলারের উগ্র জাতীয়তাবাদের মূল টার্গেট ছিল একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠী। বসনিয়া থেকে মায়ানমার সবখানে গণহত্যার মাধ্যমে বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীকে হত্যা করা হচ্ছে। একাত্তরে পাকিস্তানিরাও গণহত্যায় ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে।

১৯৭১ এ পাকিস্তানিদের ধর্মের ব্যবহার যেমন ক্রুসেডের মতোও না, আবার তেমন নাৎসিদের মতোও না। তাদের ঘৃণা ছিল বাঙালিদের প্রতি; তাদের কায়দা হাসিলের জন্য এবং গণহত্যাকে জায়েজী করণের জন্যই খুব কৌশলে ব্যবহার করেছে ধর্মকে'।[১০৬]

দ্বিতীয়ত এই গণহত্যায় একটি নির্দিষ্ট বয়সের লোকদের বেশি হত্যা করা হয়েছে বিশেষ করে তরুণ ও যুবকদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। বিশেষ করে ২০-৪০ বছর বয়সের যুবকরা গণহত্যায় পকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে পারেনি। সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। ১৬-৪০ বছর বয়সের নিহতের সংখ্যা ৫৯%, ৪১-৬০ বছর বয়সের লোক ৩০% অর্থাৎ একাত্তরে বাংলাদেশে সংঘটিত বর্বরতম গণহত্যায় প্রায় ৮৯% লোকের বয়স ১৬-৬০ বছর।

একাত্তরে সংগঠিত গণহত্যা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন এম. এ হাসান। তিনি লিখেছেন, মুক্তিযুদ্ধের প্রথম থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর অন্যতম টার্গেট ছিল অল্প বয়সী স্বাস্থ্যবান যুবকেরা, যাদেরকে মুক্তিযোদ্ধা বলে ধারণা করা হতো। তরুণ সক্ষম যুবা পুরুষ ছিল নির্বিচার হত্যার লক্ষ্যবস্তু।[১০৭]

রামেল তার *Death by Goverment* বইয়ে উল্লেখ করেছেন নির্বিচারে তরুণদের ঝেটিয়ে তুলে নিয়ে গেছে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা। এরপর এদের আর কাউকে পাওয়া যায়নি। মাঠে, ঘাটে, নদীর বাঁকে, জলাভূমিতে এবং সেনা ক্যাম্পগুলোর পাশে হাত পা বাঁধা তরুণদের মরদেহ ছিল তখনকার প্রাত্যহিক দৃশ্য।[১০৮]

গণহত্যায় তরুণ-যুবকদের হত্যা করার প্রতিফলন দেখা যায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারিতে। ১৯৬১ সালের আদমশুমারিতে দেখা

যায় দেশে ২০-৪৪ বছরের পুরুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৩১.৬ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৮৩২৬২৩৪ জন। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারিতে এই বয়সের পুরুষের সংখ্যা শতাংশে ২৮.৫ অর্থাৎ ১০৫৬৫৪৪৬ জন।[১০৯] গণহত্যার প্রভাব না থাকলে এই সংখ্যা সমানুপাতিকহারে বাড়ত।

তৃতীয়ত একাত্তরে নারীর বহুমাত্রিক ভূমিকার পরিচয় আমরা পেয়েছি। কিন্তু প্রায় উপেক্ষিত ছিল গণহত্যায় নিহত নারীদের পরিসংখ্যান। এই গবেষণায় একাত্তরে গণ শহিদের মধ্যে নারীর শতকরা হার অনুমান করা যায়। যে তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলা যায় প্রায় ১০০০০ নারী একাত্তরের গণহত্যায় নিহত হয়েছে। যদিও শরণার্থী হিসেবে ভারতে কলোরাসহ অন্যান্য মহামারিতে নিহত বিপুল সংখ্যক নারী এই হিসেবের বাইরে।

উপসংহার

… we were told to kill the Hindus and Kafirs (non-believer in God). One day in June, we cordoned a village and were ordered to kill the Kafirs in that area. We found all the village women reciting from the Holy Quran, and the men holding special congregational prayers seeking God's mercy. But they were unlucky. Our commanding officer ordered us not to waste any time." – *Confession of a Pakistani Soldier*[১১০]

গণহত্যার একটি সুনির্দিষ্ট টার্গেট থাকে। যেমন রুয়াণ্ডাতে সংঘটিত ১০০ দিনের বর্বরতায় শত শত শিশুকে জবাই করা হয়েছে। ৫৬ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদিদের, কিংবা বসনিয়ায় মুসলমানদের ধর্মীয় পরিচয়ে হত্যা করা হয়েছে। বাংলাদেশ গণহত্যাও পরিকল্পিতভাবে সংখ্যলঘু হিন্দু সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস ছিল। এই কেস স্টাডি নিশ্চিতভাবেই দেখাচ্ছে যে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু সম্প্রদায় গণহত্যার অন্যতম টার্গেট গোষ্ঠী ছিল। কিন্তু 'হিন্দু' এর সংজ্ঞা কেবল হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পাকিস্তানের কাছে বাঙালি মুসলমান-মাত্রই হিন্দুয়ানী ছিল। পাকিস্তানি অভিজাত ও সামরিক শাসকদের কাছে বাঙালি মুসলমানরাও 'সহি' মুসলমান ছিলেন না, বরঞ্চ হিন্দু প্রভাবিত মুসলমান ছিলেন। এই ধরনের মনোভাব পাকিস্তানি শাসকদের আত্মজীবনীতে স্পষ্ট এবং সেটা আমাদের এই স্টাডির সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ। উল্লেখ্য, হিন্দুমুখী মানেই ভারতমুখী এমন একটা সরল সমীকরণও শাসকদের মাথায় ছিল। ফলে এখানে জেনোসাইডে ধর্মের দুই ধরনের ভূমিকা খুঁজে পাওয়া যায়। একটা হচ্ছে 'অপর' তৈরিতে এবং অন্যটা

হচ্ছে জেনোসাইডকে জায়েজ করতে।

পাশাপশি এই গণহত্যায় একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমার লোকদের হত্যা করা হয়েছে, কারণ এদের থেকে তারা প্রতিরোধের শঙ্কা করেছিল। কিংবা হত্যার মধ্য দিয়ে ভয় সৃষ্টি একটি কারণ হতে পারে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে এই বয়সসীমার বাইরের লোকদের রেহাই দেয়া হয়েছিল। বরঞ্চ এখানে এটা দেখা যাচ্ছে যে, সকল বয়সের মানুষই নিপীড়নের শিকার হচ্ছিলেন, সেখানে যুবকদের সংখ্যা বেশি। কেননা, এই বয়সের লোকদের ধরেই নেয়া হতো তারা হয়তোবা মুক্তিযোদ্ধা, বা মুক্তিযুদ্ধপন্থী বা সম্ভাব্য এককেজন মুক্তিযোদ্ধা। অর্থাৎ, পাকিস্তানিদের যে শোষণ নিপীড়ন চলছিল তার একজন সম্ভাব্য প্রতিরোধক বা প্রতিবাদী হিসাবে যুবকদের বিবেচনা করা হতো। রওনক জাহানও বলেন,

"All through the liberation war, able-bodied young men were suspected of being actual or potential freedom fighters. Thousands were arrested, tortured, and killed. Eventually, cities and towns became bereft of young males who either took refuge in India or joined the liberation war." Especially "during the first phase" of the genocide, he writes, "young able-bodied males were the victims of indiscriminate killings."[১১১]

আর জে রামেল লিখেন,

"The Pakistan army [sought] out those especially likely to join the resistance — young boys. Sweeps were conducted of young men who have never been seen again. Bodies of youths would be found in fields, floating down rivers, or near army camps. As can be imagined, this terrorized all young men and their families within reach of the army. Most between the ages of fifteen and twenty-five began to flee from one village to another and toward India. Many of those reluctant to leave their homes were forced to flee by mothers and sisters concerned for their safety."[১১২]

এই প্রবন্ধ নিশ্চিত করে যে, পাকিস্তানিদের অধিকাংশ কর্মকাণ্ড ছিল প্রতিশোধমূলক। সেখানে ধর্ম-বর্ণ-লিংগ নির্বিশেষে সবাই হত্যার শিকার হয়েছেন। কর্মকাণ্ডের ধরন থেকেই জেনোসাইডের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। তারা

বাঙালিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও স্বাধীনতার দাবিকে ন্যাস্যৎ করতে চেয়েছিল। তাদের বাঙালি-বিরোধী মনোভাব হিন্দু-বিরোধী মনোভাবের সাথে সম্পর্কিত। বাঙালি মুসলমানদেরকে অধস্তন মুসলমান হিসাবে বিবেচনা করা হতো, কারণ তারা হিন্দু প্রতিবেশী দ্বারা প্রভাবিত। ফলে তারা যখন বাঙালিদের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে জেনোসাইড পরিচালিত করে, তখন সেখানে সাম্প্রদায়িক মনোভাব সেই ঘটনাতে বড়ো ধরনের ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে এই ভূখণ্ডের অন্যান্য জাতিসত্তাকে নিয়ে বাঙালি সেই জেনোসাইডের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে গিয়ে একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য: মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশ ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতনের রাজনীতি*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা ২০১৯
২. Robert Payne, *Massacre: The Tragedy at Bangla Desh and the Phenomenon of Mass Slaughter Throughout History*, Macmillan Company, New York, 1973, P. 50
৩. Anthony Mascarenhas, *The Rape of Bangladesh*, Vikas Publications, Delhi, 1971, P. 110
৪. খুলনায় প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম গণহত্যা জাদুঘর, ১১ সদস্যের একটি ট্রাস্টি বোর্ডের অধীনে পরিচালিত। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এতে সহায়তা করেছে ও করছে।
৫. মুনতাসীর মামুন, 'ভূমিকা'; সত্যজিৎ রায় মজুমদার, *দামেরখণ্ড গণহত্যা*, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৪
৬. সিরিজের পাহাড়তলী, জগতমল্লপাড়া, উনসত্তরপাড়া, মুজাফরাবাদ, বন্দর গ্রাম ও নাথপাড়া গণহত্যা শিরোনামে ৬টি গ্রন্থের লেখক আমি। এছাড়া গণহত্যা জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক হিসেবে পাণ্ডুলিপিগুলো সম্পাদনা পর্যায়ে একাধিকবার পড়েছি। গবেষকদের দিক নির্দেশনা দিয়েছি। এ ছাড়া এই ১০০টি গ্রন্থ লির্মাণে গবেষক মামুন সিদ্দিকী সহযোগী সম্পাদক হিসাবে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন।
৭. মাসুদ রানা, *কোদালিয়া শহীদনগর গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৮
৮. বিবরণের জন্য: মুনতাসীর মামুন, *চুকনগর গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৫
৯. শংকর মল্লিক, *ঝাউডাঙ্গা গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৭, পৃ. ১৭
১০. রুবী আফরোজ, *দৌমোহনী ঘাট গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০২০, পৃ. ৫৩

১১. নাজমুন নাহার লাইজু, *তারাপুর চা-বাগান গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৯, পৃ. ৫৬
১২. আইরীন আহমেদ, *সোহাগপুর গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৭, পৃ. ১৪
১৩. মৌসুমী রহমান, *পাকুরিয়া গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৮, পৃ. ৪০
১৪. শংকর মল্লিক, পৃ. ১৭
১৫. হাফিজ আহমেদ, *বিলমাড়িয়া বাজার গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৯, পৃ. ২৩
১৬. আরিফুল হক, *হরিপুর গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৯, পৃ. ১৫
১৭. এম এ হালিম বিশ্বাস, *বরগুনা কারাগার গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০২০, পৃ. ৫৯
১৮. আতিয়া আক্তার লুনা, *মুগরুল গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৮
১৯. জয়দুল হোসেন, *বিটঘর গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৮
২০. মামুন তরফদার, *ছাব্বিশা গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৮, পৃ. ২৩
২১. আমিনুর রহমান সুলতান, *শালিহার গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৮, পৃ. ২৩
২২. দিব্যদ্যুতি সরকার, *রংপুর গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৮, পৃ. ৩৩
২৩. অমল কুমার, *আজগড় গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৮, পৃ. ১৩
২৪. আজহারুল আজাদ জুয়েল, *ঝানজিরা গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৮, পৃ. ৯৬
২৫. হুসনে-আরা-খানম, *বাগধানি পালপাড়া গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৮, পৃ. ৩৪
২৬. চৌধুরী শহীদ কাদের, *নাথপাড়া ও আবদুরপাড়া গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৭, পৃ. ৩৬
২৭. মাসুদ রানা, *কোদালিয়া শহীদনগর গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৮
২৮. শিরিনা পারভীন, *তালাইমারী, রাণীনগর, রামচন্দ্রপুর গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৮, পৃ. ৫২
২৯. হৈমন্তী শুক্লা কাবেরী, *বিড়ালদাহ গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৭
৩০. নাজমুন নাহার লাইজু, *তারাপুর চা-বাগান গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ

বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৯, পৃ. ৫৮
৩১. এম এ হাসান, *৭১-এর গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ*, *তাম্রলিপি*, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২৩
৩২. আফসান চৌধুরী, *হিন্দু জনগোষ্ঠীর একাত্তর*, ইউপিএল, ঢাকা ২০২০
৩৩. Anthony Mascarenhas, op. cit, P. 111
৩৪. তানভীর সালেহীন ইমন, *আয়লা-বিদ্যানগর গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৯, পৃ. ১৮
৩৫. Report on Population
৩৬. Sheelendra Kumar Singh et al. *Bangladesh Documents,* UPL, Dhaka, 1999, P.446
৩৭. *U.S. State Department, Foreign Relations of The United States, 1969–1976,* Volume XI, 'South Asia Crisis, 1971', P. 165
৩৮. সিরাজুল ইসলাম এবং শাহজাহান মিয়া (সম্পা.), 'জনসংখ্যা', *বাংলাপিডিয়া*, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১৩ [online source: https://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%96%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE]
৩৯. মো. হেলাল উদ্দীন, *কাতলমারি গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৮, পৃ. ৮৪
৪০. মুনিরা জাহান সুমি, *গাবখান গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৮, পৃ. ১৩
৪১. আমিনুর রহমান সুলতান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
৪২. নজরুল ইসলাম মণ্ডল, *তাহেরপুর গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৮, পৃ. ১৪
৪৩. আবদুর রাজ্জাক, *তাকিপুর গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৮, পৃ. ৭৭
৪৪. রাকিব সিদ্দিকী, *রেলস্টেশন মাদ্রাসা গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৮, পৃ. ১০১
৪৫. সুস্মিতা দাশ, *বরইতলা গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৭, পৃ. ৩১
৪৬. মৌসুমী রহমান, *দৌগাছি গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৯, পৃ. ৭৮
৪৭. আজহারুল আজাদ জুয়েল, *ঝানজিরা গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৮, পৃ. ৯৫
৪৮. আরিফুল হক, *হরিপুর গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৮, পৃ. ৩৫
৪৯. হৈমন্তী শুক্লা কাবেরী, *বিড়ালদাহ গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৭, পৃ. ৩৬
৫০. প্রাগুক্ত

৫১. আজরিন আফরিন, *কেওয়াড় গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৭, পৃ. ১৯
৫২. চৌধুরী শহীদ কাদের, *জগৎমল-পাড়া গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৫, পৃ. ৩৭
৫৩. মৌসুমী রহমান, *আতাইকুলা গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৯, পৃ. ১৫
৫৪. সত্যজিৎ রায় মজুমদার, *দামেরখণ্ড গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৪,পৃ. ১৫
৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬
৫৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮
৫৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪
৫৮. *প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪*
৫৯. মো. রোকনুজ্জামান খান, *জগৎপুর গণহত্যা*, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণাকেন্দ্র, খুলনা, ২০১৫, পৃ. ২৪
৬০. তপন পালিত, *পাঁচগাও গণহত্যা*, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৫, পৃ. ২৮
৬১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩
৬২. গৌরাঙ্গ নন্দী, *দেয়াড়া গণহত্যা*, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণাকেন্দ্র, খুলনা, ২০১৫, পৃ. ৩৩
৬৩. সত্যজিৎ রায় মজুমদার, *শ্রীধাম লক্ষীখালি গণহত্যা*, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণাকেন্দ্র, খুলনা, ২০১৫, পৃ. ১৯
৬৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০
৬৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪
৬৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫
৬৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮
৬৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭
৬৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১
৭০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬
৭১. আহম্মেদ শরীফ, *ঝাড়ুয়ার বিল গণহত্যা*, গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৫, পৃ. ১৮
৭২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮
৭৩. মুনিরা জাহান সুমি, *রমানাথপুর গণহত্যা*, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৫, পৃ. ২২
৭৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩
৭৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬
৭৬. এম এ হাসান, *যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ*, ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি, জেনোসাইড আর্কাইভ ও হিউম্যান স্টাডিজ সেন্টার, ঢাকা, ২০০১
৭৭. *প্রাগুক্ত*

৭৮. বিনয় মিত্র, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস: সত্য-অসত্য অর্ধসত্য*, ২০১৬ ইত্যাদি, পৃ. ২২৩
৭৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩
৮০. সত্যজিৎ রায় মজুমদার, পৃ. ২৪-২৫
৮১. সুস্মিতা দাস, *হরিণাগোপাল-বাগবাটি গণহত্যা*, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৫, পৃ. ১৪
৮২. যাহিদ সুবহান, *লক্ষীপুর গণহত্যা*, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৯, পৃ. ৫০
৮৩. এম এ হাসান, *যুদ্ধ ও নারী*, তাম্রলিপি, ঢাকা, পৃ. ৭৮
৮৪. চৌধুরী শহীদ কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭
৮৫. আনোয়ার আলী, 'অব্যক্ষ কথার গভীর মত', ২৯ মার্চ ২০২১, *ডেইলি স্টার* (বাংলা)।
৮৬. আহম্মেদ শরীফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮
৮৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০
৮৮. মুনতাসীর মামুন, *পাকিস্তানি জেনারেলদের মন বাঙালি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ*, সময়, ২০১০, পৃ. ৩৮
৮৯. ফজলুল কাদের কাদেরী (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ জেনোসাইড অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস*, সংঘ প্রকাশন, ২০০৩, পৃ. ১৫১
৯০. এম এ হাসান, *৭১-এর গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ*, *তাম্রলিপি*, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২০
৯১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮
৯২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য: আফসান চৌধুরী, ২০২০
৯৩. Kennedy, Senator Edward, "Crisis in South Asia – A report to the Subcommittee investigating the Problem of Refugees and Their Settlement, Submitted to U.S. Senate Judiciary Committee", 1 November 1971, U.S. Govt. Press, page 66
৯৪. R.J. Rummel, *Death By Government*, Transaction Publishers, New Brunswick, N.J.1994 (Http://Www.Hawaii.Edu/Powerkills/NOTE1.HTM)
৯৫. আফসান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১-২
৯৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১
৯৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২
৯৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪
৯৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬
১০০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭
১০১. *1971 Bengali Hindu Genocide* (https://www.hinduamerican.org/1971-bangladesh-genocid)
১০২. তানভীর সালেহীন ইমন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১
১০৩. *Statesman*, 13 May 1971
১০৪. আবুল বাশার, *গাভা-নরেরকাঠী গণহত্যা*, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা ২০২০, পৃ. ১০০
১০৫. মুনতাসীর মামুন, ২০১৯, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮
১০৬. সহুল আহমদ, *মুক্তিযুদ্ধে ধর্মের অপব্যবহার*, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা ২০১৯, পৃ. ১৫
১০৭. এম এ হাসান, *যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ*, ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি, জেনোসাইড আর্কাইভ ও হিউম্যান স্টাডিজ সেন্টার, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৬
১০৮. এম এ হাসান, *৭১-এর গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ*, তাম্রলিপি, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২২
১০৯. *Bangladesh Census 1974*, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Dhaka, 1974
১১০. Bangladesh Genocide Archive: *http://www.genocidebangladesh.org/*
১১১. Rounaq Jahan, "Genocide in Bangladesh", in Samuel Totten and William S. Parsons et al., *Century of Genocide: Critical Essays and Eyewitness Accounts* (2nd ed.). Routledge, P. 298.
১১২. R.J. Rummel, *Death by Government: Genocide and Mass Murder Since 1900*, Routledge, 1997, P. 329

পরিশিষ্ট ১

সারণি ১: গণহত্যাগুলোর জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক বিশ্লেষণ

ক্রম.	জেলার নাম	গণহত্যার সংখ্যা	গণহত্যার নাম	উপজেলার নাম
১	বাগেরহাট	৪টি	দামেরখণ্ড গণহত্যা	মোংলা
			ডাকরা গণহত্যা	রামপাল
			শ্রীধাম লক্ষীখালি গণহত্যা	মোরেলগঞ্জ
			আব্দুল রসুলপুর-বাঁশবাড়িয়া গণহত্যা	সদর
২	সিলেট	৩টি	লালমাটিয়া, জৈনপুর, ও খাজাঞ্চি বাড়ি গণহত্যা	দক্ষিণ সুরমা
			খাদিমনগর চা-বাগান গণহত্যা	সদর (২টি)
			তারাপুর চা-বাগান গণহত্যা	
৩	চট্টগ্রাম	৭টি	মুজাফরাবাদ গণহত্যা	পটিয়া
			পাহাড়তলী গণহত্যা	পাহাড়তলী
			উনসত্তরপাড়া গণহত্যা	রাউজান (২টি)
			জগতমল্লপাড়া গণহত্যা	
			বন্দরগ্রাম গণহত্যা	আনোয়ারা
			নাথপাড়া ও আবদুরপাড়া গণহত্যা	হালিশহর থানা
			ছুটি খাঁ দিঘি গণহত্যা	মিরসরাই
৪	কুমিল্লা	৪টি	বেলতলী গণহত্যা	লাকসাম
			কৃষ্ণপুর-ধনঞ্জয় গণহত্যা	সদর (৩টি)
			কুমিল্লা পুলিশ লাইন্স গণহত্যা	
			বরগুনা জেলখানা গণহত্যা	

ক্রম.	জেলার নাম	গণহত্যার সংখ্যা	গণহত্যার নাম	উপজেলার নাম
৫	নীলফামারী	৩টি	গোলাহাট গণহত্যা	সৈয়দপুর
			কালীগঞ্জ গণহত্যা	জলঢাকা
			বালারখাইল গণহত্যা	সদর
৬	ময়মনসিংহ	২টি	বিনোদবাড়ি মানকোন গণহত্যা	মুক্তাগাছা
			শালিহর গণহত্যা	
৭	খুলনা	৭টি	বাদামতলা গণহত্যা	বটিয়াঘাটা (২টি)
			চকরাখালী গণহত্যা	
			চুকনগর গণহত্যা	ডুমুরিয়া (২টি)
			রংপুর গণহত্যা	
			বাজুয়া গণহত্যা	দাকোপ
			আজগড়া গণহত্যা	তেরখাদা
			দেয়াড়া গণহত্যা	দিঘলিয়া
৮	বরিশাল	৩টি	কাঠিরা গণহত্যা	আগৈলঝাড়া
			ওয়াপদা গণহত্যা	সদর
			গাভা-নরেরকাঠী গণহত্যা	বানারীপাড়া
১০	কুড়িগ্রাম	২টি	হাতিয়া গণহত্যা	উলিপুর
			শংকর মাধবপুর গণহত্যা	রাজিবপুর
১১	ঝালকাঠি	১টি	কাঠিপাড়া গণহত্যা	রাজাপুর
১২	শেরপুর	২টি	জগৎপুর গণহত্যা	ঝিনাইগাতী
			সোহাগপুর গণহত্যা	নালিতাবাড়ি
১৩	দিনাজপুর	৯টি	বহলা গণহত্যা	বিরল
			চড়ারহাট গণহত্যা	নবাবগঞ্জ
			পশ্চিম রাজারামপুর গণহত্যা	বিরল
			ঝানজিরা গণহত্যা	সদর
			কাতোলমারী গণহত্যা	নবাবগঞ্জ
			জলাপুকুড়পাড় গণহত্যা	বীরগঞ্জ
			দৌমোহনী ঘাট গণহত্যা	বোচাগঞ্জ
			চৌপুকুড়িয়া মাঝপাড়া গণহত্যা	বীরগঞ্জ
			মাঝডাঙ্গা গণহত্যা	সদর

ক্রম.	জেলার নাম	গণহত্যার সংখ্যা	গণহত্যার নাম	উপজেলার নাম
১৪	ঢাকা	২টি	কল্যাণপুর গণহত্যা	১১নং ওয়ার্ড ডিসিসি
			মালাকারটোলা গণহত্যা	সূত্রাপুর থানা
১৫	মৌলভীবাজার	১টি	পাঁচগাঁও গণহত্যা	রাজনগর
১৬	ঝালকাঠী	৩টি	বেশাইনখান গণহত্যা	সদর
			রমানাথপুর গণহত্যা	সদর
			গাবখান গণহত্যা	সদর
১৭	টাঙ্গাইল	২টি	গোড়ান সাটিয়াচড়া গণহত্যা	মির্জাপুর
			ছাব্বিশা গণহত্যা	ভূঞাপুর
১৮	রংপুর	১টি	ঝাড়ুয়ার বিল গণহত্যা	বদরগঞ্জ
১৯	চাঁদপুর	১টি	বড় রেলস্টেশন গণহত্যা	সদর
২০	সিরাজগঞ্জ	৩টি	হরিণাগোপাল-বাগবাটি গণহত্যা	সদর
			বরইতলা গণহত্যা	কাজীপুর
			চড়িয়া শিকা গণহত্যা	উল্লাপাড়া
২১	কিশোরগঞ্জ	২টি	বরইতলা গণহত্যা	সদর
			আয়লা-বিদ্যানগর গণহত্যা	করিমগঞ্জ
২২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২টি	বিটঘর গণহত্যা	সরাইল
			ধর্মতীর্থ গণহত্যা	সরাইল
২৩	চুয়াডাঙ্গা	২টি	লালব্রিজ গণহত্যা	আলমডাঙ্গা
			সরোজগঞ্জ বাজার গণহত্যা	সদর
২৪	ভোলা	১টি	ওয়াপদা কলোনি-খেয়াঘাট গণহত্যা	
২৫	নোয়াখালী	৩টি	গোপালপুর গণহত্যা	বেগমগঞ্জ
			শ্রীপুর-সোনাপুর গণহত্যা	সদর
			মোহাম্মদপুর—গান্ধী আশ্রম গণহত্যা	চাটখিল
২৬	রাজশাহী	৯টি	বিড়ালদহ গণহত্যা	পুঠিয়া
			তাহেরপুর গণহত্যা	বাগমারা
			যোগীশো ও পালশা গণহত্যা	দুর্গাপুর
			মুগরুল গণহত্যা	মোহনপুর
			বাগধানী পালপাড়া গণহত্যা	পবা
			হরিপুর গণহত্যা	পবা

ক্রম.	জেলার নাম	গণহত্যার সংখ্যা	গণহত্যার নাম	উপজেলার নাম
			সাঁকোয়া গণহত্যা	মোহনপুর
			তালাইমারী, রাণীনগর, রামচন্দ্রপুর গণহত্যা	বোয়ালিয়া
			তকিপুর গণহত্যা	তকিপুর
২৭	মুন্সিগঞ্জ	২টি	কেওয়ার গণহত্যা	
			গোসাইরচর গণহত্যা	গজারিয়া
২৮	সাতক্ষীরা	১টি	সাতক্ষীরা	
২৯	নওগাঁ	৩টি	পাকুড়িয়া গণহত্যা	মান্দা
			আতাইকুলা গণহত্য	রানীনগর
			দোগাছি গণহত্যা	সদর
৩০	ফরিদপুর	১টি	কোদালিয়া শহীদনগর	নগরকান্দা
৩১	যশোর	১টি	রেলস্টেশন মাদরাসা গণহত্যা	সদর
৩২	নাটোর	৪টি	উত্তরবঙ্গ চিনিকল গণহত্যা	লালপুর
			বিলমাড়ীয়া বাজার গণহত্যা	লালপুর
			চৌকিরপাড় গণহত্যা	সদর
			পারকোল গণহত্যা	বড়াইগ্রাম
৩৩	নড়াইল	১টি	তুলারামপুর গণহত্যা	সদর
৩৪	নরসিংদী	১টি	ডাঙ্গা গণহত্যা	পলাশ
৩৫	ফেনী	১টি	হরিপুর গণহত্যা	ছাগলনাইয়া
৩৬	পাবনা	১টি	লক্ষীপুর গণহত্যা	আটঘরিয়া
৩৭	গাইবান্ধা	২টি	কাশিয়াবাড়ী গণহত্যা	পলাশবাড়ী
			বৈরী হরিণমারী গণহত্যা	পলাশবাড়ী
৩৮	ঠাকুগাঁও	১টি	ভাতারমারী ইক্ষু ফার্ম গণহত্য	পীরগঞ্জ
৩৯	পঞ্চগড়	১টি	জেলা পরিষদ ডাকবাংলো গণহত্যা	সদর
৪০	বরগুনা	১টি	তৈলকুপি গণহত্যা	সদর

পরিশিষ্ট ২

সারণি ২: কেসস্টাডিতে ব্যবহৃত ১০০টি গণহত্যার পরিচিত

ক্রম	লেখক/ প্রকাশকের নাম	গ্রন্থের নাম	গণহত্যার তারিখ	উপজেলা	জেলা	প্রকাশ কাল
১.	সত্যজিৎ রায় মজুমদার	দামেরখণ্ড গণহত্যা	মে	মোংলা	বাগেরহাট	ডিসেম্বর, ২০১৪
২.	তপন পালিত	লালমাটিয়া, জৈনপুর, ও খাজাঞ্চি বাড়ি গণহত্যা	-	দক্ষিণ সুরমা	সিলেট	ডিসেম্বর, ২০১৪
৩.	চৌধুরী শহীদ কাদের	মুজাফরাবাদ গণহত্যা	৩ মে	পটিয়া	চট্টগ্রাম	ডিসেম্বর, ২০১৪
৪.	মামুন সিদ্দিকী	বেলতলী গণহত্যা		লাকসাম	কুমিল্লা	ডিসেম্বর, ২০১৪
৫.	আহম্মেদ শরীফ	কালীগঞ্জ গণহত্যা	২৭ মে	জলঢাকা	নীলফামারী	ডিসেম্বর, ২০১৪
৬.	শান্তা পত্রনবীশ	বিনোদবাড়ি মানকোন গণহত্যা	২ আগস্ট	মুক্তাগাছা	ময়মনসিংহ	ডিসেম্বর, ২০১৪
৭.	গৌরাঙ্গ নন্দী	বাদামতলা গণহত্যা	১৯ মে	বটিয়াঘাটা	খুলনা	ডিসেম্বর, ২০১৪
৮.	আহম্মেদ শরীফ	গোলাহাট গণহত্যা	১৩ জুন	সৈয়দপুর	নীলফামারী	ডিসেম্বর, ২০১৪
৯.	চৌধুরী শহীদ কাদের	পাহাড়তলী গণহত্যা	১০ নভেম্বর	পাহাড়তলী	চট্টগ্রাম	ডিসেম্বর, ২০১৪
১০.	হিমু অধিকারী	কাঠিরা গণহত্যা	৩০ মে	আগৈলঝাড়া	বরিশাল	ডিসেম্বর, ২০১৪
১১.	মিঠুন সাহা	হাতিয়া গণহত্যা	১৩ নভেম্বর	উলিপুর	কুড়িগ্রাম	মার্চ, ২০১৫
১২.	মুনিরা জাহান সুমি	কাঠিপাড়া গণহত্যা	১৭ মে	রাজাপুর	ঝালকাঠি	মার্চ, ২০১৫
১৩.	মো: রোকনুজ্জামান খান	জগৎপুর গণহত্যা	৩০ এপ্রিল	ঝিনাইগাতী	শেরপুর	মার্চ, ২০১৫

ক্রম	লেখক/ প্রকাশকের নাম	গ্রন্থের নাম	গণহত্যার তারিখ	উপজেলা	জেলা	প্রকাশ কাল
১৪.	চৌধুরী শহীদ কাদের	উনসত্তরপাড়া গণহত্যা	১৩ এপ্রিল	রাউজান	চট্টগ্রাম	মার্চ, ২০১৫
১৫.	আহম্মেদ শরীফ	বালারখাইল গণহত্যা	১২ এপ্রিল	সদর	নীলফামারী	মার্চ, ২০১৫
১৬.	আজহারুল আজাদ জুয়েল	বহলা গণহত্যা	১৩ ডিসেম্বর	বিরল	দিনাজপুর	মার্চ, ২০১৫
১৭.	আলী আকবর টাবী	কল্যাণপুর গণহত্যা	২৮ এপ্রিল	১১নং ওয়ার্ড ডিসিসি	ঢাকা	মার্চ, ২০১৫
১৮.	তপন পালিত	পাঁচগাঁও গণহত্যা	৭ মে	রাজনগর	মৌলভীবাজার	মার্চ, ২০১৫
১৯.	গৌরাঙ্গ নন্দী	দেয়াড়া গণহত্যা	২৭ আগস্ট	দিঘলিয়া	খুলনা	মার্চ, ২০১৫
২০.	মুনিরা জাহান সুমি	বেশাইনখান গণহত্যা	২০ জুন	সদর	ঝালকাঠী	মার্চ, ২০১৫
২১.	মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত)	চুকনগর গণহত্যা	২০ মে	ডুমুরিয়া	খুলনা	মে, ২০১৫
২২.	চৌধুরী শহীদ কাদের	জগতমল্লপাড়া গণহত্যা	১৩ এপ্রিল	রাউজান পৌরসভা	চট্টগ্রাম	ডিসেম্বর, ২০১৫
২৩.	বিষ্ণুপদ বাগচী	ডাকরা গণহত্যা	২১ মে	রামপাল	বাগেরহাট	ডিসেম্বর, ২০১৫
২৪.	মামুন তরফদার	গোড়ান সাটিয়াচড়া গণহত্যা	৩ এপ্রিল	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল	ডিসেম্বর, ২০১৫
২৫.	শাহীন আলম	চড়ারহাট গণহত্যা	১০ অক্টোবর	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর	ডিসেম্বর, ২০১৫
২৬.	মোতাহার হোসেন মাহবুব	কৃষ্ণপুর-ধনঞ্জয় গণহত্যা	১১ সেপ্টেম্বর	সদর	কুমিল্লা	ডিসেম্বর, ২০১৫
২৭.	সত্যজিৎ রায় মজুমদার	শ্রীধাম লক্ষীখালি গণহত্যা	২৪ মে	মোরেলগঞ্জ	বাগেরহাট	ডিসেম্বর, ২০১৫
২৮.	আহম্মেদ শরীফ	ঝাড়ুয়ার বিল গণহত্যা	১৭ এপ্রিল	বদরগঞ্জ	রংপুর	ডিসেম্বর, ২০১৫
২৯.	দেলোয়ার হোসেন	বড় রেলস্টেশন গণহত্যা	এপ্রিল	সদর	চাঁদপুর	ডিসেম্বর, ২০১৫
৩০.	মুনিরা জাহান সুমি	রমানাথপুর গণহত্যা	১৬ মে	সদর	ঝালকাঠী	ডিসেম্বর, ২০১৫
৩১.	আজহারুল আজাদ জুয়েল	পশ্চিম রাজারামপুর গণহত্যা	৫ জ্যৈষ্ঠ	বিরল	দিনাজপুর	ডিসেম্বর, ২০১৫

ক্রম	লেখক/ প্রকাশকের নাম	গ্রন্থের নাম	গণহত্যার তারিখ	উপজেলা	জেলা	প্রকাশ কাল
৩২.	সুস্মিতা দাস	হরিণাগোপাল-বাগবাটি গণহত্যা	২৭ মে	সদর	সিরাজগঞ্জ	মে ২০১৭
৩৩.	চৌধুরী শহীদ কাদের	বন্দরগ্রাম গণহত্যা	২১ মে	আনোয়ারা	চট্টগ্রাম	মে ২০১৭
৩৪.	হারেছ উজ-জামান	বরইতলা গণহত্যা	১৩ অক্টোবর	সদর	কিশোরগঞ্জ	মে ২০১৭
৩৫.	জয়দুল হোসেন	বিটঘর গণহত্যা	৩১ অক্টোবর	সরাইল	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মে ২০১৭
৩৬.	ইমরান মাহফুজ	লালব্রিজ গণহত্যা		আলমডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা	মে ২০১৭
৩৭.	মিঠুন সাহা	শংকর মাধবপুর গণহত্যা	২ অক্টোবর	রাজিবপুর	কুড়িগ্রাম	মে ২০১৭
৩৮.	রেহানা পারভীন	ওয়াপদা কলোনি-খেয়াঘাট গণহত্যা			ভোলা	মে ২০১৭
৩৯.	দিব্যদ্যুতি সরকার	রংপুর গণহত্যা	১৫ এপ্রিল	ডুমুরিয়া	খুলনা	মে ২০১৭
৪০.	মো. নুর নবী	গোপালপুর গণহত্যা	১৯ আগস্ট	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী	মে ২০১৭
৪১.	আইরীন আহমেদ	সোহাগপুর গণহত্যা	২৫ জুলাই	নালিতাবাড়ি	শেরপুর	মে ২০১৭
৪২.	চৌধুরী শহীদ কাদের	নাথপাড়া ও আবদুরপাড়া গণহত্যা	৩১ মার্চ	হালিশহর থানা	চট্টগ্রাম	সেপ্টেম্বর ২০১৭
৪৩.	সত্যজিৎ রায় মজুমদার	বাজুয়া গণহত্যা	১২ মে	দাকোপ	খুলনা	সেপ্টেম্বর ২০১৭
৪৪.	হৈমন্তী শুক্লা কাবেরী	বিড়ালদহ গণহত্যা	১২ ও ১৩ এপ্রিল	পুঠিয়া	রাজশাহী	সেপ্টেম্বর ২০১৭
৪৫.	শহীদুল ইসলাম খোন্দকার	ছুটি খাঁ দিঘি গণহত্যা	২৭-২৮ মার্চ ও ৬ ডিসেম্বর	মিরসরাই	চট্টগ্রাম	সেপ্টেম্বর ২০১৭
৪৬.	আজরিন আফরিন	কেওয়ার গণহত্যা			মুন্সিগঞ্জ	সেপ্টেম্বর ২০১৭
৪৭.	শংকর মল্লিক	ঝাউডাঙ্গা গণহত্যা			সাতক্ষীরা	সেপ্টেম্বর ২০১৭
৪৮.	সুস্মিতা দাস	বরইতলা গণহত্যা	নভেম্বর	কাজীপুর	সিরাজগঞ্জ	সেপ্টেম্বর ২০১৭
৪৯.	দিব্যেন্দু দীপ	মালাকারটোলা গণহত্যা	২৭ মার্চ	সূত্রাপুর থানা	ঢাকা	সেপ্টেম্বর ২০১৭
৫০.	মুক্তা আক্তার	গোসাইরচর গণহত্যা	৯ মে	গজারিয়া	মুন্সিগঞ্জ	সেপ্টেম্বর ২০১৭
৫১.	অমল কুমার গাইন	আজগড়া গণহত্যা	১৭ এপ্রিল	তেরখাদা	খুলনা	মে ২০১৮
৫২.	নজরুল ইসলাম মন্ডল	তাহেরপুর গণহত্যা	২৩ এপ্রিল	বাগমারা	রাজশাহী	মে ২০১৮
৫৩.	মো. নুরুল ইসলাম	চকরাখালী গণহত্যা	২৪ এপ্রিল	বটিয়াঘাটা	খুলনা	মে ২০১৮
৫৪.	এ কে এম কায়সারুজ্জামান	যোগীশো ও পালশা গণহত্যা	১৬ মে	দুর্গাপুর	রাজশাহী	মে ২০১৮
৫৫.	আতিয়া আকতার লুনা	মুগরুল গণহত্যা	১৮ নভেম্বর	মোহনপুর	রাজশাহী	মে ২০১৮
৫৬.	হোসনে আরা খানম	বাগধানী পালপাড়া গণহত্যা	২৯ এপ্রিল ও ১৬ নভেম্বর	পবা	রাজশাহী	মে ২০১৮
৫৭.	মো. গোলাম সারওয়ার	হরিপুর গণহত্যা	১৩ নভেম্বর	পবা	রাজশাহী	মে ২০১৮
৫৮.	আমিনুর রহমান সুলতান	শালিহর গণহত্যা			ময়মনসিংহ	মে ২০১৮
৫৯.	*মামুন সিদ্দিকী	কুমিল্লা পুলিশ লাইন্স গণহত্যা	২৫ মার্চ	কুমিল্লা	কুমিল্লা	মে ২০১৮
৬০.	মৌসুমী রহমান	পাকুড়িয়া গণহত্যা	২৮ আগস্ট	মান্দা	নওগাঁ	আগস্ট ২০১৮
৬১.	মাসুদ রানা	কোদালিয়া শহীদনগর গণহত্যা	১ জুন	নগরকান্দা	ফরিদপুর	আগস্ট ২০১৮
৬২.	মুনিরা জাহান সুমি	গাবখান গণহত্যা	মে	সদর	ঝালকাঠী	আগস্ট ২০১৮
৬৩.	সৈয়দ মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী	সাঁকোয়া গণহত্যা	এপ্রিল	মোহনপুর	রাজশাহী	আগস্ট ২০১৮
৬৪.	বিষ্ণুপদ বাগচী	আব্দুল রসুলপুর-বাঁশবাড়িয়া গণহত্যা	১৬ মে	সদর	বাগেরহাট	ডিসেম্বর ২০১৮
৬৫.	আজহারুল আজাদ জুয়েল	ঝানজিরা গণহত্যা	২৮ অক্টোবর	সদর	দিনাজপুর	ডিসেম্বর ২০১৮
৬৬.	জয়দুল হোসেন	ধর্মতীর্থ গণহত্যা	১৬ অক্টোবর	সরাইল	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ডিসেম্বর ২০১৮
৬৭.	মামুন তরফদার	ছাব্বিশা গণহত্যা	১৭ নভেম্বর	ভূঞাপুর	টাঙ্গাইল	ডিসেম্বর ২০১৮
৬৮.	শিরীনা পারভীন	তালাইমারী, রাণীনগর, রামচন্দ্রপুর গণহত্যা	১৩ ও ১৪ এপ্রিল	বোয়ালিয়া	রাজশাহী	ডিসেম্বর ২০১৮
৬৯.	রকিব সিদ্দিকী	রেলস্টেশন	৪ এপ্রিল	সদর	যশোর	ডিসেম্বর

ক্রম	লেখক/ প্রকাশকের নাম	গ্রন্থের নাম	গণহত্যার তারিখ	উপজেলা	জেলা	প্রকাশ কাল
		মাদরাসা গণহত্যা				২০১৮
৭০.	মো. হেলাল উদ্দীন	কাতোলমারী গণহত্যা	৬ মে	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর	ডিসেম্বর ২০১৮
৭১.	মো. মাহবুবর রহমান	উত্তরবঙ্গ চিনিকল গণহত্যা	৫ মে	লালপুর	নাটোর	ডিসেম্বর ২০১৮
৭২.	আব্দুর রাজ্জাক	তকিপুর গণহত্যা	২৯ এপ্রিল	তকিপুর	রাজশাহী	ডিসেম্বর ২০১৮
৭৩.	জহুরুল কাইয়ুম	কাশিয়াবাড়ী গণহত্যা	১১ জুন	পলাশবাড়ী	গাইবান্ধা	ডিসেম্বর ২০১৮
৭৪.	মো. মাসুদুর রহমান	ওয়াপদা গণহত্যা	২৫ এপ্রিল	সদর	বরিশাল	ডিসেম্বর ২০১৮
৭৫.	মৌসুমী রহমান	আতাইকুলা গণহত্যা	২৫ এপ্রিল	রানীনগর	নওগাঁ	জুন ২০১৯
৭৬.	মৌসুমী রহমান	দোগাছি গণহত্যা	২৫ এপ্রিল	সদর	নওগাঁ	জুন ২০১৯
৭৭.	হাফিজ আহমেদ	বিলমাড়ীয়া বাজার গণহত্যা	২৭ ও ২৮ জুলাই	লালপুর	নাটোর	জুন ২০১৯
৭৮.	সুমা কর্মকার	চৌকিরপাড় গণহত্যা	১৯ এপ্রিল	সদর	নাটোর	জুন ২০১৯
৭৯.	আফরোজা পারভীন	তুলারামপুর গণহত্যা	১৭ জুলাই	সদর	নড়াইল	জুন ২০১৯
৮০.	মৌসুমী রহমান	সরোজগঞ্জ বাজার গণহত্যা	১৬ এপ্রিল	সদর	চুয়াডাঙ্গা	জুন ২০১৯
৮১.	তানভীর সালেহীন ইমন	আয়লা-বিদ্যানগর গণহত্যা	২০-২১ এপ্রিল এবং ১২-১৩ নভেম্বর	করিমগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ	জুন ২০১৯
৮২.	সুরাইয়া আক্তার	ডাঙ্গা গণহত্যা	২৯ নভেম্বর	পলাশ	নরসিংদী	জুন ২০১৯
৮৩.	আরিফুল হক	হরিপুর গণহত্যা	২২ জুন	ছাগলনাইয়া	ফেনী	জুন ২০১৯
৮৪.	যাহিদ সুবহান	লক্ষীপুর গণহত্যা	২০ আগস্ট	আটঘরিয়া	পাবনা	জুন ২০১৯
৮৫.	এ.কে.এম গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ	শ্রীপুর-সোনাপুর গণহত্যা	১৫ জুন	সদর	নোয়াখালী	জুন ২০১৯
৮৬.	তাসনীম আলম	মোহাম্মদপুর–গান্ধী আশ্রম গণহত্যা	৪ সেপ্টেম্বর	চাটখিল	নোয়াখালী	জুন ২০১৯

ক্রম	লেখক/ প্রকাশকের নাম	গ্রন্থের নাম	গণহত্যার তারিখ	উপজেলা	জেলা	প্রকাশ কাল
৮৭.	নাজমুন নাহার লাইজু	খাদিমনগর চা-বাগান গণহত্যা	২৮ মার্চ ও ১৯ এপ্রিল	সদর	সিলেট	জুন ২০১৯
৮৮.	নাজমুন নাহার লাইজু	তারাপুর চা-বাগান গণহত্যা	১৮ এপ্রিল ও ১ মে	সদর	সিলেট	জুন ২০১৯
৮৯.	মিতা চক্রবর্তী	জলাপুকুড়পাড় গণহত্যা	১৭ মে	বীরগঞ্জ	দিনাজপুর	জুন ২০২০
৯০.	রুবী আফরোজ	দৌমোহনী ঘাট গণহত্যা	২২ মে	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর	জুন ২০২০
৯১.	মো. সাইফুদ্দীন এমরান	বৈরী হরিণমারী গণহত্যা	১৭ এপ্রিল	পলাশবাড়ী	গাইবান্ধা	জুন ২০২০
৯২.	গ্যালি বিনতে শিরিন	ভাতারমারী ইক্ষু ফার্ম গণহত্যা	১৭ এপ্রিল	পীরগঞ্জ	ঠাকুগাঁও	জুন ২০২০
৯৩.	মো. মিজানুর রহমান	চৌপুকুড়িয়া মাঝপাড়া গণহত্যা	১৩ জুন	বীরগঞ্জ	দিনাজপুর	জুন ২০২০
৯৪.	শামীমা ওয়াদুদ	মাঝডাঙ্গা গণহত্যা	২৫ জুন	সদর	দিনাজপুর	জুন ২০২০
৯৫.	মাহফুজুর রহমান	চড়িয়া শিকা গণহত্যা	২৫ এপ্রিল	উল্লাপাড়া	সিরাজগঞ্জ	জুন ২০২০
৯৬.	শাপলা খাতুন	পারকোল গণহত্যা	১১ এপ্রিল	বড়াইগ্রাম	নাটোর	জুন ২০২০
৯৭.	মো. নুরুল হুদা	জেলা পরিষদ ডাকবাংলো গণহত্যা	১৯ এপ্রিল	সদর	পঞ্চগড়	জুন ২০২০
৯৮.	আবুল বাশার	গাভা-নরেরকাঠী গণহত্যা	২ মে	বানারীপাড়া	বরিশাল	জুন ২০২০
৯৯.	মোহাম্মদ মোস্তাক আহমদ	তৈলকুপি গণহত্যা	২৯ ও ৩০ মে	সদর	বরগুনা	জুন ২০২০
১০০.	এম এ হালিম বিশ্বাস	বরগুনা জেলখানা গণহত্যা	২৮ মে	সদর	কুমিল্লা	জুন ২০২০

* অনেকগুলো গণহত্যা সংঘটিত হওয়ার সঠিক তারিখ পাওয়া যায়নি। গ্রন্থগুলো প্রকাশ করেছে গণহত্যা জাদুঘর, বাংলাদেশ ও গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র।

পরিশিষ্ট ৩

সারণি ৩: গণহত্যার নিহতদের লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণ

গ্রন্থের নাম	সণাক্তকৃত নিহতের সংখ্যা	সণাক্তকৃতদের মধ্যে নারী
দামেরখণ্ড গণহত্যা	৩৭	০
লালমাটিয়া, জৈনপুর, ও খাজাঞ্চি বাড়ি গণহত্যা	১০	১
মুজাফরাবাদ গণহত্যা	২৬৩	৮৬
বেলতলী গণহত্যা	৬	০
কালীগঞ্জ গণহত্যা	৭১	৬
বিনোদবাড়ি মানকোন গণহত্যা	১০৪	৪১
বাদামতলা গণহত্যা	২৪	৫
গোলাহাট গণহত্যা	৪৯	২২
পাহাড়তলী গণহত্যা	৬০	১
কাঠিরা গণহত্যা	২৯	২
হাতিয়া গণহত্যা	৪১৪	১২
কাঠিপাড়া গণহত্যা	৩৮	০
জগৎপুর গণহত্যা	৩০	১৩
উনসত্তরপাড়া গণহত্যা	৫১	৫
বালারখাইল গণহত্যা	১৪	০
বহলা গণহত্যা	৩৮	০
কল্যাণপুর গণহত্যা	২৫	১
পাঁচগাঁও গণহত্যা	৯৮	৫
দেয়াড়া গণহত্যা	১৪	০
বেশাইনখান গণহত্যা	২৫	০
চুকনগর গণহত্যা	৬২	৫
জগতমল্লপাড়া গণহত্যা	৪০	১৪
ডাকরা গণহত্যা	১০০	৭
গোড়ান সাটিয়াচড়া গণহত্যা	৫৭	১৫

গ্রন্থের নাম	সণাক্তকৃত নিহতের সংখ্যা	সণাক্তকৃতদের মধ্যে নারী
চড়ারহাট গণহত্যা	৯৮	২
কৃষ্ণপুর-ধনঞ্জয় গণহত্যা	৩৩	১১
শ্রীধাম লক্ষীখালি গণহত্যা	৬৮	১৫
ঝাড়ুয়ার বিল গণহত্যা	৩৬৭	৬৩
বড় রেলস্টেশন গণহত্যা	৩	০
রমানাথপুর গণহত্যা	১৪	০
পশ্চিম রাজারামপুর গণহত্যা	২৫	০
হরিণাগোপাল-বাগবাটি গণহত্যা	৩৯	২
বন্দরগ্রাম গণহত্যা	৮২	৩
বরইতলা গণহত্যা	১৭১	০
বিটঘর গণহত্যা	৮০	০
লালব্রিজ গণহত্যা	০	০
শংকর মাধবপুর গণহত্যা	৫৩	০
ওয়াপদা কলোনি- খেয়াঘাট গণহত্যা	৭১	২
রংপুর গণহত্যা	১৩	০
গোপালপুর গণহত্যা	২৪	০
সোহাগপুর গণহত্যা	১২১	০
নাথপাড়া ও আবদুরপাড়া গণহত্যা	৪৫	১
বাজুয়া গণহত্যা	২৫	০
বিড়ালদহ গণহত্যা	৪৫	৭
ছুটি খাঁ দিঘি গণহত্যা	১৯	০
কেওয়ার গণহত্যা		
ঝাউডাঙ্গা গণহত্যা	২৭	২
বরইতলা গণহত্যা	৭৩	৪
মালাকারটোলা গণহত্যা	১৫	০
গোসাইরচর গণহত্যা	১০২	১০
আজগড়া গণহত্যা	১৯	২
তাহেরপুর গণহত্যা	৩৩	১
চকরাখালী গণহত্যা	৩	০
যোগীশো ও পালশা গণহত্যা	৪২	০

গ্রন্থের নাম	সণাক্তকৃত নিহতের সংখ্যা	সণাক্তকৃতদের মধ্যে নারী
মুগরুল গণহত্যা	১৫	০
বাগধানী পালপাড়া গণহত্যা	১৮	০
হরিপুর গণহত্যা	৫১	০
শালিহর গণহত্যা	১২	৩
কুমিল্লা পুলিশ লাইন্স গণহত্যা	৩৫	০
পাকুড়িয়া গণহত্যা	৭৩	২
কোদালিয়া শহীদনগর গণহত্যা	৩৭	২৪
গাবখান গণহত্যা	৮	৬
সাঁকোয়া গণহত্যা	৩৮	৮
আব্দুল রসুলপুর-বাঁশবাড়িয়া গণহত্যা	২৮	১
ঝানজিরা গণহত্যা	২২	১
ধর্মতীর্থ গণহত্যা	৪৯	০
ছাব্বিশা গণহত্যা	৪২	৭
তালাইমারী, রাণীনগর, রামচন্দ্রপুর গণহত্যা	৩৪	৯
রেলস্টেশন মাদরাসা গণহত্যা	১৬	০
কাতোলমারী গণহত্যা	৬৭	৩৭
উত্তরবঙ্গ চিনিকল গণহত্যা	৪২	০
তকিপুর গণহত্যা	৭	০
কাশিয়াবাড়ী গণহত্যা	৫৭	৬
ওয়াপদা গণহত্যা	১২	০
আতাইকুলা গণহত্যা	৫২	০
দোগাছি গণহত্যা	৫৩	২
বিলমাড়ীয়া বাজার গণহত্যা	৪০	০
চৌকিরপাড় গণহত্যা	১৮	০

গ্রন্থের নাম	সণাক্তকৃত নিহতের সংখ্যা	সণাক্তকৃতদের মধ্যে নারী
তুলারামপুর গণহত্যা	১২	০
সরোজগঞ্জ বাজার গণহত্যা	২৫	০
আয়লা-বিদ্যানগর গণহত্যা	৮	০
ডাঙ্গা গণহত্যা	৪৩	৬
হরিপুর গণহত্যা	৯	০
লক্ষীপুর গণহত্যা	২৮	০
শ্রীপুর-সোনাপুর গণহত্যা	৪০	০
মোহাম্মদপুর—গান্ধী আশ্রম গণহত্যা	১৫	০
খাদিমনগর চা-বাগান গণহত্যা	৬৫	৩
তারাপুর চা-বাগান গণহত্যা	৪৩	১
জলাপুকুড়পাড় গণহত্যা	১০	০
দৌমোহনী ঘাট গণহত্যা	৬৫	২
বৈরী হরিণমারী গণহত্যা	১৩	০
ভাতারমারী ইক্ষু ফার্ম গণহত্যা	৭	০
চৌপুকুড়িয়া মাঝপাড়া গণহত্যা	১৬	৫
মাঝডাঙ্গা গণহত্যা	৬	০
চড়িয়া শিকা গণহত্যা	১৫০	৪
পারকোল গণহত্যা	২৫	১০
জেলা পরিষদ ডাকবাংলো গণহত্যা	৪৪	১
গাভা-নরেরকাঠী গণহত্যা	৫৭	৮
তৈলকুপি গণহত্যা	৮৭	০
বরগুনা জেলখানা গণহত্যা	২৮	৬